আকাইদ ও ফিকহ

العقائد والفقه

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আকাইদ ও ফিকহ
اَلْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ

দাখিল
সপ্তম শ্রেণি

রচনা
ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান
ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারূফ
মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

সম্পাদনা
মাওলানা রূহুল আমীন খান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০২০
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২২

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশ** গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে **আকাইদ ও ফিকহ** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর কায়সার আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ : আল আকাইদ

অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়	আল আকাইদ	১	৬ষ্ঠ অধ্যায়	ফেরেশতাদের প্রতি ইমান	৩৩
১ম পাঠ	সহিহ আকিদার গুরুত্ব	১	১ম পাঠ	আল কুরআনে বর্ণিত ফেরেশতাদের কার্যক্রম	৩৩
২য় পাঠ	ভ্রান্ত আকিদার কুফল	২	২য় পাঠ	কিরামান কাতেবিনের কাজ	৩৫
২য় অধ্যায়	আদ দীন	৬	৩য় পাঠ	মুনকার ও নকিরের পরিচয় ও দায়িত্ব	৩৫
১ম পাঠ	দীনের পরিচয় ও মৌলিক দিক	৬	৭ম অধ্যায়	কিতাবসমূহের প্রতি ইমান	৩৯
২য় পাঠ	ইমানের শাখাসমূহ	৭	১ম পাঠ	আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমানের গুরুত্ব	৩৯
৩য় পাঠ	তাযকিয়ার পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা	৮	২য় পাঠ	আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব	৪০
৩য় অধ্যায়	আল্লাহর প্রতি ইমান	১২	৩য় পাঠ	আল কুরআনের বিধান অস্বীকার করার পরিণাম	৪১
১ম পাঠ	কুরআনের আলোকে আল্লাহর প্রতি ইমান	১২	৮ম অধ্যায়	আখেরাতের প্রতি ইমান	৪৫
২য় পাঠ	সুন্নাহর দৃষ্টিতে ইমান	১৩	১ম পাঠ	চিরস্থায়ী আখেরাত জীবনে মুক্তির আশা	৪৫
৪র্থ অধ্যায়	আত তাওহীদ	১৬	২য় পাঠ	আমলনামা ও হাউযে কাউসার	৪৬
১ম পাঠ	তাওহিদের স্তরসমূহ	১৬	৯ম অধ্যায়	তাকদিরের প্রতি ইমান	৫০
২য় পাঠ	আল আসমাউল হুসনা	১৭	১ম পাঠ	তাকদিরের পরিচয় ও এর প্রতি বিশ্বাস	৫০
৩য় পাঠ	আল্লাহর ইবাদত	২১	২য় পাঠ	তাকদিরের উপর বিশ্বাস না করার পরিণাম	৫১
৫ম অধ্যায়	নবি-রসুলগণের প্রতি ইমান	২৬	১০ম অধ্যায়	সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আকিদা	৫৪
১ম পাঠ	আল কুরআনে বর্ণিত নবি ও রসুল	২৬	১ম পাঠ	সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় ও মর্যাদা	৫৪
২য় পাঠ	নবি ও রসুলের সাথে সাধারণ মানুষের পার্থক্য	২৮	২য় পাঠ	সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৫৫
৩য় পাঠ	রসুলুল্লাহ (ﷺ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবি	২৯	৩য় পাঠ	সাহাবিগণ সমালোচনার উর্ধ্বে	৫৬

দ্বিতীয় ভাগ : আল ফিকহ্

১ম অধ্যায়	ইলমে ফিকহের ইতিহাস	৫৯	১ম পাঠ	আহকামুস সালাত	৯০
১ম পাঠ	ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৫৯	২য় পাঠ	সালাতের কিরাআত	৯৮
২য় পাঠ	মাযহাবের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা	৬০	৩য় পাঠ	কাযা সালাত	৯৯
৩য় পাঠ	ইমামগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৬১	৪র্থ পাঠ	সালাতুল বেতের	১০৪
২য় অধ্যায়	নাজাসাত	৬৬	৫ম পাঠ	জানাযা সালাত	১০৮
১ম পাঠ	নাজাসাত পরিচিতি ও প্রকারভেদ	৬৬	৬ষ্ঠ পাঠ	নফল সালাত	১১৮
২য় পাঠ	নাজাসাতযুক্ত পানির বিধান	৬৮	৬ষ্ঠ অধ্যায়	সাওম	১২১
৩য় পাঠ	কয়েকটি নাজাসাত (নাপাক) প্রাণী	৬৯	১ম পাঠ	আহকামুস সাওম	১২১
৩য় অধ্যায়	তাহারাত	৭২	২য় পাঠ	নফল সাওম	১২৯
১ম পাঠ	পবিত্রতা অর্জন ও পবিত্রকরণ	৭২	৭ম অধ্যায়	যাকাত	১৩৪
২য় পাঠ	তায়াম্মুম	৭৮	১ম পাঠ	যাকাতের পরিচয় ও ফযিলত	১৩৪
৩য় পাঠ	মেসওয়াক	৮২	২য় পাঠ	যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ	১৩৬
৪র্থ অধ্যায়	সালাতের জন্য ইকামত	৮৬	৩য় পাঠ	যার উপর যাকাত ফরয	১৩৭
১ম পাঠ	ইকামতের পরিচয়	৮৬	৪র্থ পাঠ	যাকাত আদায় না করার পরিণাম	১৩৮
২য় পাঠ	ইকামতের সুন্নত তরিকা	৮৭	৫ম পাঠ	যেসব সম্পদের যাকাত ফরয	১৩৯
৫ম অধ্যায়	আস সালাত	৯০	৮ম অধ্যায়	আল আতইমা ওয়াল আশরিবা	১৪২

তৃতীয় ভাগ : আল আখলাক

১ম অধ্যায়	উত্তম চরিত্র	১৪৭	৩য় অধ্যায়	দোআ ও মুনাজাত	১৬৯
২য় অধ্যায়	অসচ্চরিত্র	১৬২			

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْـمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম ভাগ
আল আকাইদ
اَلْعَقَائِدُ

প্রথম অধ্যায়
আকাইদ (اَلْعَقَائِدُ)

প্রথমপাঠ
সহিহ আকিদার গুরুত্ব

اَلْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلَّذِى عَلَّمَنَا الـدِّيْنَ بِوَسِيْلَةِ رُوْحِ الْأَمِيْنِ عَلٰى لِسَانِ حَبِيْبِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِنَا الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

আকাইদের পরিচয়

আকিদা (عَقِيْـدَةٌ) শব্দটি **عقـد** মূল ধাতু থেকে এসেছে। শব্দটির অর্থ বন্ধন ও বিশ্বাস। আকিদা (عَقِيْـدَةٌ) শব্দটি একবচন। বহুবচনে আকাইদ (عَقَائِـدُ)। যে দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা, চেতনা পরিচালিত হয় এবং কর্মসমূহ সম্পাদনের পথ ও পদ্ধতি বৈধতা লাভ করে, তারই নাম আকিদা।

সহিহ আকিদার পরিচয়

শরিয়তের পরিভাষায় সহিহ আকিদার পরিচয় হলো –

مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَالضَّمِيْرُ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ وَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

অর্থ : তাওহিদ, রিসালাত ও প্রিয়নবি (ﷺ) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার নামই আকিদা। (ইকদুল জেনান, পৃ. ৭)

আকিদা বিশুদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো চিন্তা, দর্শন, কর্ম যথার্থ ও ফলপ্রসূ হয় না। আমলকে যদি দেহ ধরা হয়, আকিদা এর প্রাণ। দেহ যেভাবে প্রাণ ছাড়া অকার্যকর তেমনি সহিহ আকিদা ছাড়া আমলও অকার্যকর। তাই ইসলামি শরিয়তে আকিদা বিষয়ে সহিহ ইলম অর্জন করা ফরয করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার ذَاتٌ (যাত) বা সত্তা, صِفَاتٌ (সিফাত) বা গুণাবলি, حُقُوْقٌ (হুকুক) বা আইনগত অধিকার, اِلٰـهٌ (ইলাহ) বা ইবাদত ও সম্মান পাওয়ার একমাত্র হকদার হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট চিন্তা-দর্শন না থাকলে সহিহ আকিদা মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না।

(مَالِكٌ) বা অধিকর্তা, (رَبٌّ) বা পালনকর্তা, (اِلٰـهٌ) বা ইবাদতের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তাঁর প্রেরিত ও মনোনীত নবি ও রসুলগণ তাঁরই দীনের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। আকিদার মূল বিষয় হলো আল্লাহ তাআলার গুণাবলিসহ তাঁর সত্তা, নুরের তৈরি ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, সকল নবি ও রসুল, পরকালীন জীবন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত তকদিরের ভালো-মন্দ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা এবং এসব সঠিকভাবে উপলব্ধি করা ইলমুল আকাইদ এর মূল বিষয়।

এক আল্লাহকে ও তাঁর প্রিয় রসুল (ﷺ)-কে মানার মাঝে যে সকল শান্তি নিহিত তা দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে উপলব্ধি করা, মনে স্থান দেওয়াই ইমানের মূল চেতনা। আকিদা সহিহ না হলে বান্দার কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় পাঠ

ভ্রান্ত আকিদার কুফল

সহিহ বা বিশুদ্ধ আকিদা নেক আমল কবুলের পূর্বশর্ত। উপরে উল্লিখিত সহিহ আকিদাসমূহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি পরিপন্থী কোনো কিছুর উপর বিশ্বাস করা ভ্রান্ত আকিদা। আকিদা সহিহ না করে একজন লোক যদি সারা জীবন সালাত আদায় করে, সাওম পালন করে, হজ করে, যাকাত দেয়; তা কবুল হবে না, তার সব আমলই নিষ্ফল হবে। যেমন কাদিয়ানি সম্প্রদায় সালাত আদায় করে, সাওম পালন করে, হজ করে, আযান দেয়, মসজিদ তৈরি করে কিন্তু তাঁরা প্রিয় নবি (ﷺ)-কে শেষ নবি মানে না। তারা মনে করে তাদের ধর্মের প্রবর্তক গোলাম আহমদ কাদিয়ানিই শেষ নবি। এই একটি ভ্রান্ত আকিদার ফলে তারা যে মুসলমানদের দলভুক্ত নন, এ বিষয়ে সমগ্র বিশ্বের আলেম সমাজ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।

অনুরূপভাবে যারা প্রিয় রসুল (ﷺ)-কে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ মনে করে, প্রিয়নবি (ﷺ) মরে মাটিতে মিশে গেছেন, তাঁর কোনো ক্ষমতাই নেই ইত্যাদি ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করে তাদের কোনো আমলই কবুল হবে না। আবার কাউকে আল্লাহর সমতুল্য বা সমগুণসম্পন্ন ও সমশক্তিধর মনে করা সবচেয়ে বড় জুলুম। এ ধরনের কাজ শিরক, আল্লাহর সাথে শিরক করা বড় গুনাহের কাজ।
আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই শিরক করা চরম জুলুম। (সুরা লোকমান, ১৩)
এইভাবে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল মনে করা এবং রসুল (ﷺ)-এর সুন্নতকে অবজ্ঞা করার ফল জাহান্নাম। তাই বলা হয়– إِهَانَةُ الرَّسُوْلِ كُفْرٌ

অর্থ : রসুল (ﷺ)-কে অবজ্ঞা করা, তার শান ও মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করা কুফুরি।

প্রিয়নবি (ﷺ)-এর শানে বেআদবি করলে সকল আমল বরবাদ হয়ে হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না, কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। (সুরা হুজুরাত, ২)

এককথায়, সহিহ আমল এবং আমলের ফলাফল পেতে হলে সহিহ আকিদা অবশ্যই চাই। শিরক, কুফর ও নেফাক মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। সহিহ আকিদা নিয়ে শরিয়ত ও তরিকতের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আকিদা বিষয়ে সহিহ ইলম অর্জন করার বিধান কী?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২.সবচেয়ে বড় জুলুম কোনটি?

ক. শিরক খ. কুফর

গ. নিফাক ঘ. বিদআত

৩. ইলমুল আকাইদের কাজ হচ্ছে-

i. আল্লাহর যাত ও সেফাত জানা

ii. ইমানের শাখাসমূহ দৃঢ় বিশ্বাস করা

iii. নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

জসিম বিশেষ সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত। সে বলে নবুয়তের দরজা উন্মুক্ত, আরও নবি আসতে পারে।

৪. জসিমের কথা অনুযায়ী বিশ্বাস করলে সে কী হবে?

ক. মুনাফিক খ. কাফির

গ. ফাসিক ঘ. মুশরিক

৫. এমতাবস্থায় জসিমের উচিত হচ্ছে-

i. ভ্রান্ত আকিদা পরিহার করা

ii. উক্ত বক্তব্য পরিহার করা

iii. ঐ সম্প্রদায়ের সংশ্রব ত্যাগ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জাবের একজন বড় অফিসার। তিনি নিয়মিত সালাত, সাওম পালন করেন। কিন্তু তিনি মনে করেন রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মতো দোষে-গুণে মানুষ। তাঁর অফিসের একজন কর্মচারী তাকে বললেন, স্যার আপনি এ বিশ্বাস করলে সালাত, সাওম যতই করেন, আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

ক. নেক আমল কবুলের পূর্বশর্ত কী?

খ. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ আয়াতটুকুর অনুবাদ কর।

গ. জাবেরের বিশ্বাসটি শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন হচ্ছে? আলোচনা কর।

ঘ. অফিসের কর্মচারীর বক্তব্যকে পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদ দীন

اَلـدِّيْـنُ

প্রথম পাঠ

দীনের পরিচয় ও মৌলিক দিক

দীনের পরিচয়

দীন (اَلدِّيْنُ) শব্দের অর্থ আনুগত্য, শক্তি, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বন্দেগি, দাসত্ব, নিয়ম-নীতি, হিসাব-নিকাশ, ফয়সালা, জীবনব্যবস্থা ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা ইসলামকে একমাত্র মনোনীত দীন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন (জীবনব্যবস্থা)।

(সুরা আলে ইমরান, ১৯)

সুতরাং যে জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষ ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি, শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, তাকেই দীন ইসলাম বলে।

দীনের মৌলিক দিক

দৃঢ় বিশ্বাসই হলো দীনের মূলভিত্তি। দীন হলো আল্লাহ ও তাঁর মাখলুকের মাঝে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম। হজরত জিবরাইল (ﷺ) আদব ও তা'যিমের সাথে রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে ছাত্রের মতো বসে প্রিয়নবি (ﷺ)-কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দীনের মৌলিক দিকগুলো বর্ণনা করেন। প্রশ্নোত্তর সম্বলিত এ হাদিসকে 'হাদিসে জিবরাইল' বলা হয়। এ হাদিসের মাধ্যমে দীনের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা তিনটি বিষয়ের সমন্বিত ও সমষ্টিগত রূপ। তা হলো–

(ক) আল ইমান (اَلْإِيْمَانُ) ; (খ) আল ইসলাম (اَلْإِسْلَامُ) ও (গ) আল ইহসান (اَلْإِحْسَانُ)

২০২৬

দীন ইসলামের বাহিরে গ্রহণযোগ্য কোনো দীন নেই। কেউ দাবী করলেও তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْـخَاسِرِيْنَ.

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে, তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা আলে ইমরান, ৮৫)

দ্বিতীয় পাঠ

ইমানের শাখাসমূহ

ইমান হলো বিশ্বাসের নাম। রসুলুল্লাহ (ﷺ) যা নিয়ে এসেছেন এবং দিয়েছেন, তার ওপর পূর্ণ বিশ্বাসকেই ইমান বলা হয়। ইমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। এ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْـحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ.

অর্থ : ইমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা আছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই–এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো, পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ইমানের অন্যতম শাখা। (বুখারি, মুসলিম)

ইমান পবিত্র বৃক্ষ। যার শাখা-প্রশাখা সত্তরের অধিক। এর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য ২০টি শাখা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। আল্লাহর যাত, সিফাত ও তাওহিদের উপর বিশ্বাস।

২। আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই নশ্বর এ বিশ্বাস রাখা।

৩। ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

৪। আসমানি কিতাবসমূহ সত্য এ বিশ্বাস রাখা।

৫। রসুল (ﷺ)গণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

৬। তাকদিরের উপর বিশ্বাস।

৭। আখেরাতের উপর বিশ্বাস। (মুনকার নকিরের ছাওয়াল জওয়াব, কবরের আযাব, পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়া, হিসাব, মিযান, পুলসিরাত ইত্যাদি)।

৮। জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ও তাতে চিরস্থায়ীভাবে থাকার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

৯। জাহান্নামের ভয় ও আযাব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

১০। আল্লাহ তাআলার প্রতি মহব্বত পোষণ করা।

১১। আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা (মুহাজির, আনসার ও রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশধরগণের প্রতি ভালোবাসা পোষণ) এবং আল্লাহর জন্যই কারো প্রতি ঘৃণা পোষণ করা।

১২। রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর দরুদ শরিফ পাঠ ও তাঁর সুন্নতের অনুসরণের মাধ্যমে সর্বাগ্রে তাঁর প্রতি নিরঙ্কুশ ভালোবাসা রাখা।

১৩। কাজে কর্মে লোক দেখানো ও কপটতামুক্ত ইখলাস বা নিষ্ঠা প্রদর্শন।

১৪। তওবা ও অনুশোচনা।

১৫। খাওফ বা ভবিষ্যত পরিণতির বিষয়ে ভয় করা।

১৬। আশান্বিত থাকা।

১৭। হতাশা ও নিরাশা ত্যাগ করা।

১৮। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

১৯। ওফা বা বিশ্বস্ত হওয়া।

২০। সবর বা সহনশীলতার গুণ অর্জন করা। (উমদাতুল কারী, ১/৩৪৪)

তৃতীয় পাঠ
তাযকিয়ার পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

তাযকিয়া (تَزْكِيَةٌ) শব্দের অর্থ পবিত্রকরণ, পবিত্রতা, পরিশুদ্ধ করা। যে জ্ঞান অর্জন ও তদানুযায়ী আমল করলে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক পূত-পবিত্র হয়ে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসুল (ﷺ)-এর নৈকট্য লাভ করা যায়, তাকে ইলমুত তাযকিয়া (عِلْمُ التَّزْكِيَةِ) বলে। কুরআন মাজিদের ২৯ টি আয়াতে তাযকিয়ার কথা বলা হয়েছে।

তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধি হতে হবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের। তার সূচনা হবে ব্যক্তির আত্মিক পরিশুদ্ধি থেকে। নবি-রসুলগণের প্রধান চারটি দায়িত্বের মধ্যে তাযকিয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তিলাওয়াতে আয়াত, তাযকিয়া, তালিমুল কিতাব ও তালিমুল হিকমা-এ চারটি বিষয়ের কোনো একটি বাদ দিলে রসুল (ﷺ)-কে মানা হয় না। এ জন্যই তাযকিয়া ও তাসাউফের ইলম অর্জন করা ফরযে আইন। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ যেভাবে শিক্ষা করা ও আমল করা ফরযে আইন, একইভাবে ইলমুত্ তাযকিয়া ও তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করা এবং আমলে পরিণত করাও ফরযে আইন।

মানুষের শারীরিক রোগ চিকিৎসার জন্য যেভাবে ডাক্তার প্রয়োজন, অদ্রূপ আত্মিক রোগের জন্য শায়খ বা আধ্যাত্মিক ওস্তাদের প্রয়োজন, যিনি আল্লাহ, রসুল (ﷺ) ও সালেহ বান্দাগণের তরিকা মোতাবেক তাযকিয়ার জ্ঞান দান করবেন। আল্লাহ তাআলা তাযকিয়া অর্জনকারীদের সফলকাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

অর্থ : নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তাঁর প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে। (সুরা আলা, ১৪-১৫)

আল্লাহ তাআলা প্রথমত তাযকিয়া অর্জন, দ্বিতীয়ত পরিশুদ্ধ অন্তরে যিকির জারিকরণ এবং তৃতীয় পর্যায়ে পবিত্র অন্তরে যিকির চলা অবস্থায় সালাত আদায় করার কথা বলেছেন। তাই আত্মিক পরিশুদ্ধি, অন্তরে যিকির ও বাহ্যিক সালাত আদায়, এ তিনটি কাজই একজন মুমিনের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইমানের শাখা-প্রশাখা কয়টি?

ক. ৫০টি — খ. ৬০ টি

গ. ৭০ টি — ঘ. ৮০ টি

২. تَزْكِيَةٌ শব্দের অর্থ কী?

ক. পরিশুদ্ধ করা　　খ. তাসাওফ অর্জন করা

গ. নৈকট্য লাভ করা　　ঘ. বিশ্বাস করা

৩. দীন ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যা দ্বারা মানুষ–

i. ইহ-পরকালীন মুক্তি লাভ করে

ii. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে

iii. অনেক ধন-সম্পত্তি লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

মাসুদ মনে করে মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহ পচে যায়। তাই তা বিচারের জন্য উত্থিত হওয়া অসম্ভব।

৪. মাসুদের ধারণা কিসের পরিপন্থী?

ক. ইমান　　খ. ইসলাম

গ. ইহসান　　ঘ. ইবাদত

৫. এমতাবস্থায় মাসুদের করণীয় হচ্ছে–

i. আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা

ii. ইমানের সকল বিষয় বিশ্বাস করা

iii. বেশি বেশি নেক আমল করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

আবদুর রহমান সাহেব একজন হক্কানি পীরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিয়মিত যিকির আযকার করেন। তা দেখে শাহেদ আলি তাকে বললেন, চাচা এভাবে যিকির করার কী প্রয়োজন? সালাত আদায় ও সাওম পালনসহ সকল ইবাদতই যিকিরের অন্তর্গত। আবদুর রহমান সাহেব তাকে বললেন, ইবাদত বন্দেগি করার জন্য আত্মার পরিশুদ্ধতা অপরিহার্য।

ক. اَلدِّيْنُ (আদ-দীন) অর্থ কী?

খ. হাদিসে জিবরাইল বলতে কী বোঝ? লেখ।

গ. আবদুর রহমান সাহেবের কার্যক্রম ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শাহেদ আলির বক্তব্যটি সঠিক কিনা? কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কর।

২০২৫

তৃতীয় অধ্যায়
আল্লাহর প্রতি ইমান
اَلْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ

প্রথম পাঠ
পবিত্র কুরআনের আলোকে আল্লাহর প্রতি ইমান

ইমান (اَلْإِيْمَانُ) ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের প্রথম ও প্রধান বুনিয়াদ। এর অর্থ অন্তরের বিশ্বাস, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা, স্বীকার করা, ভরসা করা ইত্যাদি। কুরআন মাজিদে বিভিন্ন আঙ্গিকে ৭৮৪ বার ইমান প্রসঙ্গ এসেছে। শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমান হলো–

تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتًا وَ صِفَةً وَبِمَا جَاءَ بِهِ.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ)-এর সত্তা, গুণাবলি এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন এ সবকিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.

অর্থ : রসুল, তাঁর প্রতি প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। তাদের সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রসুলগণের প্রতি ইমান এনেছেন। (সুরা বাকারা, ২৮৫)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

অর্থ : যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাঁদের প্রভুর নিকট তাঁদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। (সুরা বাকারা, ৬২)।

ইমানের বিপরীতে কুফরির পরিণাম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

অর্থ : যে ইমানকে অস্বীকার করবে, তার যাবতীয় আমল নিষ্ফল ও পরিশেষে সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সুরা মায়েদা, ৫)

দ্বিতীয় পাঠ
সুন্নাহর দৃষ্টিতে ইমান

প্রিয়নবি (ﷺ)-কে মনে-প্রাণে মুহাব্বতের সাথে মানলে হয় মুমিন আর অস্বীকার করলে হয় কাফের। মুখে স্বীকার করে অন্তরে বিশ্বাস না করলে, সে হয় মুনাফিক। হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন– রসুলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন–

أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ؟

অর্থ : তোমরা কি জানো আল্লাহর প্রতি ইমান কী?

জবাবে তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুল (ﷺ) ভালো জানেন।

হুজুর (ﷺ) জবাবে বলেন– شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

অর্থ : (আল্লাহর প্রতি ইমান এই যে) তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই আর মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল। (সহিহ বুখারি, ১/২৯)

অন্য হাদিসে আছে, হজরত জিবরাইল (عليه السلام) প্রিয়নবি (ﷺ)-কে প্রশ্ন করলেন–

يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِيمَانُ؟

অর্থ : হে আল্লাহর রসুল (ﷺ)! ইমান বলতে কী বোঝায়?

জবাবে আল্লাহর হাবিব (ﷺ) বলেন–

اَلْإِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ.

অর্থ : ইমান হলো, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রসুলগণের উপর। তাঁর সাথে সাক্ষাত হবে এ কথার উপর, তুমি বিশ্বাস করবে শেষ দিবসের এবং তুমি বিশ্বাস করবে তাকদিরের ভালো মন্দ যা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। (মুসনদে ইমাম আযম, পৃ. ৪)

অন্য হাদিসে আছে, রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করা হলো– أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ অর্থ : কোন আমল সর্বোত্তম? জবাবে বলেন– اَلْإِيمَانُ بِاللهِ অর্থ : আল্লাহর উপর ইমান আনা। (সহিহ মুসলিম)

হাদিসের আলোকে ইমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। যার সর্বোচ্চ শাখা হলো–

لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

আর সর্বনিম্ন শাখা হলো– إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

অর্থ : যে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া। (সহিহ মুসলিম)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের প্রধান বুনিয়াদ কোনটি?

ক. ইমান খ. সালাত

গ. যাকাত ঘ. সাওম

২. اَلْإِيْمَانُ (ইমান) অর্থ কী?

ক. বিশ্বাস খ. দৃঢ়তা

গ.বন্ধন ঘ. নিরাপত্তা

৩. শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমান হল–

i. আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করা

ii. রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনিত বিষয়গুলো বিশ্বাস করা

iii. পারস্পরিক সহযোগিতা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

আজাদ পথ চলতে গিয়ে রাস্তায় একটি কাঁটা দেখতে পায়। কিন্তু সে ঐ কাঁটাটির পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে চলে যায়।

৪. আজাদের কাজটি কিসের পরিপন্থী?

ক. ইমান খ. ইসলাম

গ. ইহ্সান ঘ. ইবাদত

৫. এমতাবস্থায় আজাদের উচিত ছিল-

i. কাঁটাটি সরিয়ে ফেলা

ii. কাঁটাটি না দেখার ভান করা

iii. ইমানের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে জানা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

তালেব একজন কৃষক। তার ছোট ছেলে বিদেশে থাকে। গত বছর বন্যায় তার ফসলসমূহ নষ্ট হয়ে যায়। এতে তার সংসারে অভাব দেখা দেয় । ঐ সময় তার ছেলে বিদেশ থেকে দশ হাজার টাকা পাঠায়। এতে তার অভাব লাঘব হয়। তালেব তার প্রতিবেশি হাশমতের কাছে বলে যে, তার ছেলে টাকা না পাঠালে তাদের না খেয়ে মরতে হতো। এ কথা শুনে হাশমত তাকে বলল, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

ক. ইমানের সর্বোচ্চ শাখা কী?

খ. ইমান বলতে কী বোঝায়? লেখ

গ. তালেবের বক্তব্যকে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হাশমতের বক্তব্যটির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আত তাওহিদ

اَلتَّوْحِيْد

প্রথম পাঠ

তাওহিদের স্তরসমূহ

مَرَاتِبُ التَّوْحِيْدِ

তাওহিদ (اَلتَّوْحِيْد) শব্দটি বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। এর অর্থ হলো একত্ববাদ। আল্লাহ তাআলা একক, তাঁর কোনো শরিক নেই-এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করাকেই তাওহিদ বলে। তাওহিদের চারটি স্তর রয়েছে। তা হলো–

(ক) তাওহিদ ফিয যাত (اَلتَّوْحِيْدُ فِي الذَّاتِ) বা সত্তাগত এককত্ব।

(খ) তাওহিদ ফিস সিফাত (اَلتَّوْحِيْدُ فِي الصِّفَاتِ) বা গুণগত এককত্ব।

(গ) তাওহিদ ফিলহুকুক (اَلتَّوْحِيْدُ فِي الْحُقُوْقِ) বা অধিকারগত এককত্ব।

(ঘ) তাওহিদ ফিল ইবাদত (اَلتَّوْحِيْدُ فِي الْعِبَادَاتِ) বা ইবাদতগত এককত্ব।

(ক) তাওহিদ ফিয যাত (اَلتَّوْحِيْدُ فِي الذَّاتِ)

আল্লাহ তাআলার সত্তাগত এককত্ব। ইলাহ বা উপাস্য হিসেবে, মাবুদ হিসেবে, নিরঙ্কুশ সত্তাধিকারী হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে মেনে নেওয়াকে তাওহিদ ফিয-যাত বা সত্তাগত এককত্ব বলে, যাকে তাওহিদ ফিল উলুহিয়্যাহ (اَلتَّوْحِيْدُ فِي الْأُلُوْهِيَّةِ)ও বলা হয়।

এই তাওহিদের কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ)

(খ) তাওহিদ ফিস সিফাত (اَلتَّوْحِيْدُ فِي الصِّفَاتِ)

আল্লাহর তাআলা গুণাবলিতে তাঁর অংশীবিহীন এককত্বকে মেনে নেওয়াকে তাওহিদ ফিস সিফাত বলে। আল্লাহ তাআলার গুণাবলি একমাত্র তাঁর জন্যেই প্রযোজ্য। যেমন- আল্লাহ তাআলা (حَيٌّ قَيُّوْمٌ)

চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, আল্লাহ (رَزَّاقٌ) জীবিকাদানকারী। তিনি (مَالِكٌ) মালিক। মালিকানা একমাত্র তাঁর, এভাবে আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ক্ষেত্রে অন্য কোনো সৃষ্টিকে অংশীদার মনে না করা। এ স্তরের তাওহিদকে তাওহিদ ফিল আসমা ওয়াস সিফাত (اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ)ও বলা হয়।

(গ) তাওহিদ ফিলহুকুক (اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْـحُقُوْقِ)

আল্লাহ তাআলা সকল অধিকারের একক মালিক, এ কথা মেনে নেয়াই তাওহিদ ফিল হুকুক। আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার মালিক,সবকিছুর পালনকর্তা, সকল কিছুর সার্বভৌম অধিকার তাঁরই একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। আল্লাহকে (رَبٌّ) রব বলে স্বীকার করা। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে তাঁর সমকক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে স্বীকার না করা। সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বাস মনে-প্রাণে ধারণ করা। এ প্রকার তাওহিদকে তাওহিদ ফির রুবুবিয়্যাহ (اَلتَّوْحِيْدُ فِى الرَّ بُوْبِيَّةِ)ও বলা হয়।

(ঘ) তাওহিদ ফিল ইবাদত : (اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْعِبَادَاتِ)

একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে এককভাবে ইবাদাতের হকদার মনে করা। আল্লাহ তাআলাকেই ইবাদত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য মনে করা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ না করা, কুরবানি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা। এককথায়, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করে শুধু আল্লাহর ইবাদত করাকে তাওহিদ ফিল ইবাদত বলে।

দ্বিতীয় পাঠ

আল আসমাউল হুসনা

اَلْأَسْمَاءُ الْـحُسْنٰى

আল আসমাউল হুসনার পরিচয়

আল আসমাউল হুসনা (اَلْأَسْمَاءُ الْـحُسْنٰى)এর অর্থ হলো সুন্দর নামসমূহ। আল্লাহ (اَللّٰهُ) হচ্ছে اِسْمُ ذَاتٍ বা সত্তাগত নাম। এ মহান সত্তার প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে হলে, তাকে চিনতে হলে, তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে, তাঁর গুণাবলি এবং ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে হবে। আল্লাহ তাআলার

সত্তা যেমন সুমহান, অসীম ও অবিনশ্বর, তাঁর صِفَاتٌ বা গুণাবলি এবং ক্ষমতাও অসীম, অবিনশ্বর। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ৯৯টি গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে। এ সকল নাম দ্বারা আল্লাহ তাআলার গুণাবলি প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাকে যে সকল গুণবাচক নাম দিয়ে ডাকা হয় সেগুলোকে اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (আল আসমাউল হুসনা) বলে।

আল আসমাউল হুসনার গুরুত্ব

মানুষের জীবনে আল আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। এ সকল গুণবাচক নাম দ্বারা আমরা আল্লাহকে চিনতে পারি। মূলকথা হচ্ছে, সত্তাগত দিক থেকে আল্লাহ তাআলা যেমন এক অদ্বিতীয়, তেমনিভাবে গুণাবলি ও সিফাতের ক্ষেত্রেও তিনি একক ও অদ্বিতীয়। এ সমস্ত গুণে তাঁর কোনো শরিক এবং সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর গুণ নিরঙ্কুশ ও অসীম।

এসব গুণবাচক নাম দিয়ে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا.

অর্থ : আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সে সকল নামেই ডাকবে।
(সুরা আরাফ, ১৮০)

আসমাউল হুসনা দ্বারা আল্লাহকে ডাকলে তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন এবং তিনি জান্নাত দান করবেন। এ সম্পর্কে হাদিসে নববীতে উল্লেখ আছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعُوْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْـجَنَّةَ.

অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– আল্লাহ্ তাআলার ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো আয়ত্ত করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহিহ বুখারি)।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

কারো কোনো বিপদ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি উপস্থিত হলে, সে আসমাউল হুসনা পাঠ করে দোআ করবে, আল্লাহ তাআলা তার বিপদ দূর করে শান্তি দান করবেন। (মুসনাদে আহমদ)

আল আসমাউল হুসনা

আল্লাহ পাকের গুণবাচক নামগুলোকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। তা হলো–

(ক) আত্মপরিচয়মূলক।

(খ) সৃষ্টি বিষয়ক।

২০২৫

(গ) প্রেম ও করুণা বিষয়ক।

(ঘ) গৌরব ও মহত্ত্ব বিষয়ক।

(ঙ) জ্ঞান সম্পর্কীয়।

(চ) শক্তি ও ক্ষমতা বিষয়ক।

(ছ) শাসন বিষয়ক।

(ক) আত্মপরিচয়মূলক

(১) আল আহাদু اَلْاَحَدُ (এক)

(২) আস সামাদু اَلصَّمَدُ (অমুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত)

(৩) আল আউয়ালু اَلْاَوَّلُ (আদি)

(৪) আল আখেরু اَلْاٰخِرُ (অন্ত)

(৫) আল লাতিফু اَللَّطِيْفُ (অনুগ্রহশীল)

(৬) আল হাইয়্যু اَلْحَيُّ (চিরঞ্জীব)

(৭) আল কাইয়্যুমু اَلْقَيُّوْمُ (চিরস্থায়ী) ইত্যাদি।

২. সৃষ্টি বিষয়ক

(৮) আল খালেকু اَلْخَالِقُ (স্রষ্টা)

(৯) আল মুবদিউ اَلْمُبْدِئُ (অনুকরণ ছাড়াই স্রষ্টা)

(১০) আল মুইদু اَلْمُعِيْدُ (পুনর্জীবন দানকারী)

(১১) আল বাদীউ اَلْبَدِيْعُ (নমুনা ছাড়াই সর্বসময় সৃজনকারী) ইত্যাদি।

৩. প্রেম ও করুণা বিষয়ক

(১২) আর রহমানু اَلرَّحْمٰنُ (পরম করুণাময়)

(১৩) আর রহীমু اَلرَّحِيْمُ (অসীম দয়ালু)

(১৪) আল গাফুরু اَلْغَفُوْرُ (পরম ক্ষমাশীল)

(১৫) আর রউফু اَلرَّءُوْفُ (স্নেহশীল)

(১৬) আল ওয়াদূদু اَلْوَدُوْدُ (প্রেমময়) ইত্যাদি।

৪. গৌরব ও মহত্ত্ব বিষয়ক

(১৭) আল আযিমু اَلْعَظِيْمُ (সুমহান)

(১৮) আল আযিযু اَلْعَزِيْزُ (মহাক্ষমতাবান)

(১৯) আল মাজিদু اَلْمَجِيْدُ (মহাসম্মানী)

(২০) যুল-জালালি ওয়াল ইকরাম ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (গৌরব ও সম্মানের অধিকারী)

(২১) আল আলিয়্যু اَلْعَلِىُّ (সুমহান)

(২২) আল মুতাকাব্বিরু اَلْمُتَكَبِّرُ (অতীব মহিমান্বিত) ইত্যাদি।

৫. জ্ঞান সম্পর্কীয়

(২৩) আল বাসিরু اَلْبَصِيْرُ (সর্বদ্রষ্টা)

(২৪) আস সামিউ اَلسَّمِيْعُ (সর্বশ্রোতা)

(২৫) আল খাবিরু اَلْخَبِيْرُ (সম্যক অবহিত)

(২৬) আশ শাহিদু اَلشَّهِيْدُ (প্রত্যক্ষ কারী)

(২৭) আল হাকিমু اَلْحَكِيْمُ (মহাপ্রজ্ঞাবান) ইত্যাদি।

৬. শক্তি ও ক্ষমতা বিষয়ক

(২৮) আল কাদিরু اَلْقَدِيْرُ (সর্ব শক্তিমান)

(২৯) আল মুকতাদিরু اَلْمُقْتَدِرُ (প্রবল)

(৩০) আল জাব্বারু اَلْجَبَّارُ (মহাপরাক্রমশালী) ইত্যাদি।

৭. শাসন বিষয়ক

(৩১) আল মালেকু اَلْمَالِكُ (অধিকর্তা)

(৩২) আল হাফিযু اَلْحَفِيْظُ রক্ষাকর্তা)

(৩৩) আর রব্বু اَلرَّبُّ (প্রতিপালক)

(৩৪) আল হাসিবু اَلْحَسِيْبُ (হিসাব রক্ষক)

(৩৫) আল ওয়াকিলু اَلْوَكِيْلُ (কর্মবিধায়ক)

(৩৬) আল আদলু اَلْعَدْلُ (সর্বোচ্চ ন্যায়বিচারক) ইত্যাদি।

এছাড়া আরো যে সকল গুণবাচক নাম রয়েছে সেগুলো আল্লাহ পাকের কোনো না কোনো প্রকার গুণের প্রকাশ করে।

তৃতীয় পাঠ
আল্লাহর ইবাদত
عِبَادَةُ اللهِ

ইবাদতের পরিচয়

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ) শব্দটি একবচন। বহুবচনে اَلْعِبَادَاتُ ; শব্দটি عَبْـدٌ থেকে নির্গত। عَبْـدٌ অর্থ চরম বিনয়ের সাথে অনুগত হওয়া দাস বা বান্দা। اَلْعِبَادَةُ শব্দের অর্থ হলো–

اَلتَّذَلُّـلُ বা চূড়ান্ত বিনম্রতা ও দাসত্ব।

ইসলামের পরিভাষায় ইবাদত হলো–

اَلْعِبَادَةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالُ الْمَحَبَّةِ وَ الْـخُضُوْعِ وَالْـخَوْفِ

অর্থ: পরিপূর্ণ মুহাব্বত, বিনয় ও ভয়ের সাথে আনুগত্য করার নাম ইবাদত।

পূর্ণাঙ্গ মুহাব্বত, সর্বোচ্চ বিনয় ও পরম ভয়ের সাথে আল্লাহর প্রতি পরম সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর আনুগত্য প্রকাশকে আল্লাহর ইবাদত বলা হয়।

২০২

ইবাদতে বিনয়ের অভিব্যক্তি হবে স্বেচ্ছায় ও নিষ্ঠার সাথে। এই সম্মান ও বিনয় অনিচ্ছায়, অন্যের শক্তি প্রয়োগের কারণে বাধ্য হয়ে করলে তা ইবাদত হবে না। ইবাদতের যোগ্য এমন এক মহান সত্তা যিনি পরম সম্মানের অধিকারী, জীবন ও জীবিকার মালিক, যার উপরে ক্ষমতাবান ও দয়াবান আর কেউ নেই। নিঃসন্দেহে তিনি মহান আল্লাহ তাআলা। সবকিছুর মালিকানা যেহেতু তাঁর, তাই ইবাদতেরও একমাত্র মালিক তিনিই।

মানবজাতির প্রতি ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : হে মানুষ! ইবাদত করো তোমাদের রবের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো। (সুরা বাকারা, ২১)

আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করা জায়েয নয়। আর কেউ ইবাদতের যোগ্যও নয়। সকল নবি-রসুল উম্মতকে একই দাওয়াত দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ্ বলেন–

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰـهٍ غَيْرُهُ

অর্থ : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। (সুরা আরাফ, ৭৩)

সুরা ফাতিহায় উল্লেখ আছে– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

অর্থ : আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

এ ঘোষণা প্রতিনিয়ত আমরা দিয়ে যাই। কেননা শিরকমুক্ত ও প্রেমযুক্ত ইবাদত ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোনো ইবাদত কবুল হয় না।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الصِّفَاتِ অর্থ কী?

ক. সত্তাগত এককত্ব খ. গুণগত এককত্ব

গ. আইনগত এককত্ব ঘ. ইবাদতগত এককত্ব

২. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমাটি কোন তাওহিদের অন্তর্ভুক্ত?

ক. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الذَّاتِ   খ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الصِّفَاتِ

গ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْحُقُوْقِ   ঘ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْعِبَادَاتِ

৩. মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তাআলার কয়টি গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

ক. ৯৬ টি   খ. ৯৭ টি

গ. ৯৮ টি   ঘ. ৯৯ টি

৪.আল্লাহ তাআলার اَلرَّحْمٰنُ নামটি কী বিষয়ক?

ক. সৃষ্টি   খ. করুণা

গ. গৌরব   ঘ. ক্ষমতা

৫. اَلْعِبَادَةُ শব্দটি কোন শব্দ থেকে নির্গত?

ক. عَبْدٌ   খ. عُبُوْدٌ

গ.عِبَاد   ঘ. عُبَيْد

৬. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْعِبَادَاتِ বলতে বোঝায়–

i. একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা

ii. আল্লাহ ছাড়া কারো নামে মানত না করা

iii. একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কুরবানি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

৭. আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ববিষয়ক নাম হচ্ছে-

i. اَلْعَظِيْمُ

ii. اَلرَّحْمٰنُ

iii. اَلْعَزِيْزُ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

আসলাম সাহেব চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী । তার ধারণা, একমাত্র জনগণই তাকে চেয়্যারম্যানের ক্ষমতায় আসীন করবে।

৮. আসলাম সাহেবের এ বিশ্বাসটি কিসের পরিপন্থী?

ক. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الرُّبُوْبِيَّةِ খ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْوُلُوْهِيَّةِ

গ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الصِّفَاتِ ঘ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْعِبَادَاتِ

৯. আসলাম সাহেবের উচিত হচ্ছে-

i. আল্লাহই সকল ক্ষমতার মালিক এ কথা বিশ্বাস করা

ii. সব কিছুর অধিকার তারই এ কথা বিশ্বাস করা

iii. কেবল জনগণের ভোটের উপর নির্ভর করে থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আকাইদ বিষয়ের শিক্ষক মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব ক্লাসে তাওহিদ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, একমাত্র মাবুদ হিসেবে আল্লাহকে মেনে নেওয়াই হচ্ছে তাওহিদ ফিযযাত। রাশেদ প্রশ্ন করল, তাহলে তাওহিদ ফিস সিফাত বলতে কী বোঝায়? প্রশ্নোত্তরে মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব বলেন, আল্লাহর গুণাবলিতে তাঁর অংশীবিহীন এককত্বকে তাওহিদ ফিস সিফাত বলে।

ক. তাওহিদের স্তর কয়টি?

খ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْحُقُوْقِ বলতে কী বোঝায়?

২০২১

গ. মাওলানা আবদুর রহমান সাহেবের প্রথম বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাশেদের প্রশ্নোত্তরে মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব যা বললেন, তা ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

২। আবদুস সালাম সাহেব নিয়মিত আল আসমাউল হুসনার অযিফা আদায় করেন। তা দেখে আবদুল মজিদ সাহেব বললেন, আল্লাহ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নাম। তাই আপনার এ নামেই যিকির করা উচিত। আবদুস সালাম সাহেব তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল আসমাউল হুসনা প্রত্যেক মুসলমানের জানা আবশ্যক।

ক. رَؤُوْفٌ শব্দের অর্থ কী?

খ. اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى বলতে কী বোঝ?

গ. আবদুস সালাম সাহেবের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ 'আল আসমাউল হুসনার যিকির হলো জান্নাত লাভের সহায়ক' উক্তিটির আলোকে আবদুল মজিদ সাহেবের বক্তব্যকে মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

নবি-রসুলগণের প্রতি ইমান

اَلْإِيْمَانُ بِالـرُّسُلِ

প্রথম পাঠ

আল কুরআনে বর্ণিত নবি ও রসুল

নবি ও রসুলের পরিচয় :

নবি ও রসুলগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত বা বার্তাবাহক। মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের নিকট নবি ও রসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন। যিনি নতুন শরীয়তসহ প্রেরিত হয়েছেন তাকে রসুল বলে। আর যিনি পূর্ববর্তী রসুলের শরীয়ত অনুযায়ী দ্বীন প্রচার করেছেন তাকে নবি বলা হয়।

আল কুরআনে ২৫ জন নবি-রসুলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মজিদে বর্ণিত হয়নি এমন অনেক নবি ও রসুল রয়েছেন। আমরা তাঁদের অনেকের নাম জানি আবার অনেকের নাম জানি না। যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মহানবি (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন–

وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ.

অর্থঃ অনেক রসুল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আমি পূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রসুল যাদের কথা আপনাকে বলিনি (সুরা নিসা, ১৬৪)।

কুরআন মাজিদে ২৫ জন নবি-রসুল (ﷺ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন–

১. হজরত আদম (ﷺ)
২. হজরত ইদরিস (ﷺ)
৩. হজরত নুহ (ﷺ)
৪. হজরত ইবরাহিম (ﷺ)
৫. হজরত লুত (ﷺ)
৬. হজরত ইসমাঈল (ﷺ)

৭. হজরত ইসহাক (عليه السلام)

৮. হজরত ইয়াকুব (عليه السلام)

৯. হজরত ইউসুফ (عليه السلام)

১০. হজরত শোয়াইব (عليه السلام)

১১. হজরত মুসা (عليه السلام)

১২. হজরত হারুন (عليه السلام)

১৩. হজরত আইয়ুব (عليه السلام)

১৪. হজরত দাউদ (عليه السلام)

১৫. হজরত সুলায়মান (عليه السلام)

১৬. হজরত ইউনুস (عليه السلام)

১৭. হজরত ইলিয়াস (عليه السلام)

১৮. হজরত যাকারিয়া (عليه السلام)

১৯. হজরত ইয়াহ্ইয়া (عليه السلام)

২০. হজরত হুদ (عليه السلام)

২১. হজরত সালেহ (عليه السلام)

২২. হজরত যুলকিফল (عليه السلام)

২৩. হজরত আল ইয়াসা (عليه السلام)

২৪. হজরত ইসা (عليه السلام)

২৫. হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)

উল্লেখ্য যে, হযরত ওজায়ের (আ:) এর নবি হওয়ার বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সকল নবি ও রসুলের দীন ছিলো ইসলাম। তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেওয়াই ছিলো তাঁদের মূল কাজ।

দ্বিতীয় পাঠ

নবি ও রসুলগণের সাথে সাধারণ মানুষের পার্থক্য

নবি ও রসুল (عليهم السلام) গণের ব্যাপারে আমাদের এ আকিদা থাকতে হবে যে, তাঁরা সর্বযুগেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। শারীরিক গঠনে, বংশ পরিচয়ে, আচার-আচরণে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তাঁরা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁদের সাথে অন্য কোনো মানুষের তুলনা করা বা অন্যের মতো মনে করা চরম বেআদবি। নবি ও রসুল (عليهم السلام)গণ ছিলেন মাসুম مَعْصُوْمٌ বা নিষ্পাপ। তাঁদের সামান্যতম গুনাহ ছিলো এ ধারণা বা আকিদা পোষণ করা ইমান পরিপন্থী। তারা ছিলেন সমাজের, দেশের ও জাতির ইমাম বা প্রধান।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ.

অর্থ : এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো; তাদেরকে অহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদত করতো। (সুরা আম্বিয়া, ৭৩)।

নবি ও রসুল (عليهم السلام)গণ মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শবান ব্যক্তি। তাঁরা নবুওয়াত লাভের পূর্বে বা পরে সর্বাবস্থায় কুফরি ও শিরকসহ ছোট-বড় সর্বপ্রকার গুণাহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন। এ পবিত্রতা তাঁদের পৃথিবীতে আগমন থেকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, নবুওয়াত ও রিসালাতের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে ছিলো। তাঁরা নবুওয়াত ও রিসালাত লাভের পূর্বেও ছিলেন মা'সুম বা নিষ্পাপ এবং নবুওয়াত ও রিসালাত লাভের পরেও নিষ্পাপ এ আকিদা মন মানসিকতায় পোষণ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁদের ক্ষমা চাওয়া বা মাফ চাওয়া সবই ছিলো উম্মতের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের বিনয় প্রকাশের জন্যে।

নবি ও রসুলগণের প্রতি ইমানের দাবি

১। নবি ও রসুলগণকে জীবনের সকল পর্যায়ে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে মানতে হবে। তাদের আনুগত্যই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য। আল্লাহ বলেন–

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ.

অর্থ : কেউ রসুলের আনুগত্য করলে, সেতো আল্লাহরই আনুগত্য করলো। (সুরা নিসা, ৮০)

২। রসুলগণের আনিত হেদায়েতই একমাত্র গ্রহণযোগ্য, সর্বাধুনিক ও সার্বজনীন। একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সে হেদায়েত মোতাবেক জীবন গঠন করতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন–

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ.

অর্থ : ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা অন্বেষণ করলে তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না। (সুরা আলে ইমরান, ৮৫)

৩। নবি ও রসুল (ﷺ)গণকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে। তাঁদের নাম আদবের সাথে উচ্চারণ করতে হবে। যেমন : যখন কোন নবির নাম উচ্চারণ করা হবে তখন বলতে হবে আলাইহিস সালাম, যার সংক্ষিপ্তরূপ (عليه السلام) যেমনঃ হযরত আদম (عليه السلام), হযরত ইব্রাহিম (عليه السلام)। বলতে হবে নবি করিম (ﷺ) বলেন বা ইরশাদ করেন, হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন ইত্যাদি।

নবি ও রসুলগণের শান ও মানের খেলাফ কোনো কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকাও ইমানের দাবি।

তৃতীয় পাঠ
রসুলুল্লাহ (ﷺ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবি

রসুলুল্লাহ (ﷺ) সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

অর্থ : আমি আপনাকে সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত হিসেবেই পাঠিয়েছি। (সুরা আম্বিয়া, ১০৭)

অন্যান্য নবি ও রসুল (ﷺ) নির্দিষ্ট একটি এলাকার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রিয়নবি (ﷺ) সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন−

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সুরা সাবা, ২৮)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন−

أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ

অর্থ : আমিই রসুলগণের নেতা, এটা আমার গর্ব নয়, আমি নবিদের শেষ, এটাও আমার গর্ব নয়। (সুনানে দারেমি, ১/২৮)

এককথায় বলা যায়, আল্লাহ স্রষ্টা হিসেবে একক। আর রসুলে পাক (ﷺ) সৃষ্টি হিসেবে অনন্য। অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা শেখ সাদী (رحمه الله)-এর ভাষায়−

لا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّه

بعد آز خدا بزرگ توئي قصه مختصر

'সম্ভব নহে তোমার শান বয়ান করা যেমন তুমি হকদার

খোদার পরেই তোমার শান কাহিনী সংক্ষেপ সার।'

মহানবি (ﷺ) -এর শান ও মানকে হেয় প্রতিপন্ন করার পরিণাম

সকল নবি-রসুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইমানের অঙ্গ। আর হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশেষ নবি হওয়ার কারণে তাঁকে সম্মান করতে হবে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। কোনো কথায় বা কাজে তাঁর সাথে সামান্যতম বেয়াদবি ইমানবিধ্বংসী ও কুফরি। যে সকল শব্দ দ্বারা সাধারণ কাউকে তুচ্ছ ও হেয় করা হয় সে সকল শব্দ তাঁর সম্পর্কে বলা বা লেখা সম্পূর্ণ বেয়াদবি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পবিত্র কুরআনে কতজন নবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

ক. ২২ খ. ২৫

গ. ২৬ ঘ. ২৮

২। আল্লাহ কাকে সৃষ্টি জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন?

ক. হজরত নুহ (عليه السلام) খ. হজরত মুসা (عليه السلام)

গ. হজরত ইসা (عليه السلام) ঘ. হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)

৩। নবি-রসুলগণ হচ্ছেন -

i. সর্বোত্তম আদর্শবান ব্যক্তি

ii. আল্লাহর প্রকৃত বান্দা

iii. সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

জাহিদ বলে, নবি-রসুলগণ নিষ্পাপ একথা সঠিক নয়। কেননা তাদের দ্বারা ছোট-খাটো গুনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব।

৪। জাহিদের বক্তব্যমত বিশ্বাস করলে সে কী হয়ে যাবে?

ক. কাফির খ. ফাসিক

গ. মুনাফিক ঘ. মুশরিক

৫। এ মুহূর্তে জাহিদের করণীয় হচ্ছে -

i. পুনরায় ইমান গ্রহণ করা

ii. নবি-রসুলদের গুণাবলি স্বীকার করা

iii. উক্ত বিশ্বাসে অটল থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শাহেদ ইউনিভার্সিটির ছাত্র। সে নিয়মিত সালাত আদায় ও সাওম পালন করে এবং রসুল (ﷺ) প্রদর্শিত পন্থায় জীবন গড়ার চেষ্টা করে। একদিন তার সাথে ডেভিড নামের এক খ্রিষ্টান ছাত্রের পরিচয় হয়। অতঃপর সে তার বন্ধুত্ব গ্রহণ করলে তাকে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার আবেদন জানায়। জবাবে শাহেদ বলে, আমি তো শেষনবি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসারী, যিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক।

ক. নবি-রসুলগণের মূল কাজ কী ছিল?

খ. اَلْإِيْمَانُ بَالرُّسُلِ বলতে কী বোঝ?

গ. ডেভিডের সাথে বন্ধুত্বের পূর্বে শাহেদের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে শাহেদের কী করণীয় হতে পারে বলে তুমি মনে কর?

২। নবগ্রামে একজন মুসাফির লোক এসে বসবাস করেন। তিনি নিজে ধর্ম-কর্ম পালন করেন এবং মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেন ও পরোপকারে ব্যস্ত থাকেন। কয়েকদিন পর লোকটি নিজেকে নবি হিসেবে দাবি করেন। নবগ্রামের লোকজন তাকে মারতে উদ্যত হলে সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ক. রসুল (ﷺ)-এর শানে বেয়াদবি করার হুকুম কী?

খ. خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ বলতে কী বোঝ?

গ. মুসাফির লোকটির দাবীর যৌক্তিকতা ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নবগ্রামের লোকজনের আচরণকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফেরেশতাদের প্রতি ইমান

اَلْإِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ

প্রথম পাঠ

আল কুরআনে বর্ণিত ফেরেশতাদের কার্যক্রম

(ক) আল্লাহর হুকুম মানা ও তাসবিহ পাঠ

ফেরেশতাগণ নুরের তৈরি। তারা মানবীয় দূর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা বাসনা বা পাপেচ্ছা ও পানাহার থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদা ক্লান্তিহীনভাবে আল্লাহর গুণগান করেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করেন। ফেরেশতাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ، لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

অর্থ : তাঁরা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তাঁরা আগে বেড়ে কথা বলে না; তাঁরা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকেন। (সুরা আম্বিয়া, ২৬-২৭)

অন্যত্র আল্লাহ পাক তাঁদের বিষয়ে বলেন–

لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থ :আল্লাহ তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেন তা তাঁরা লঙ্ঘন করেন না এবং তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, তা তাঁরা পালন করেন। (সুরা তাহরিম, ৬)

(খ) আল্লাহর প্রিয় হাবিবের উপর দরুদ পড়া

ফেরেশতাদের সার্বক্ষণিক একটি দায়িত্ব হলো আল্লাহর প্রিয় হাবিবের উপর দরুদ পড়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ নবির প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবির জন্য রহমতের দোআ করেন। (সুরা আহযাব, ৫৬)

(গ) কর্ম নির্বাহ ও কর্ম বণ্টন করা

সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত, তাসবিহ ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ছাড়াও ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। মহান আল্লাহ বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য তাঁদেরকে দায়িত্ব দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ، يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ.

অর্থ: শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে। এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করে দেয়। এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে। আর যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। সেদিন প্রথম সিঙ্গাধ্বনি প্রকম্পিত করবে। (সুরা নাযিয়াত, ১-৬)

(ঘ) ওহি পৌঁছানো

ফেরেশতাদের একটি মৌলিক দায়িত্ব হলো, নবি ও রসুলগণের নিকট আল্লাহর ওহি পৌঁছান। জিবরাইল (ﷺ) বিশেষভাবে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট জিবরাইল (ﷺ) ওহি নিয়ে আসতেন।

(ঙ) মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ

ফেরেশতাগণের অন্য একটি দায়িত্ব আল্লাহর হুকুমে তাঁরই মর্জিমত মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

অর্থ: মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে, তাঁরা আল্লাহ তাআলার আদেশে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সুরা রাদ, ১১)

(চ) মুমিন বান্দাগণের জন্য দোআ করা

ফেরেশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম হলো ইমানদারদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ ও দোআ করা। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

অর্থ : আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। (সুরা মুমিন, ৭)

দ্বিতীয় পাঠ

কিরামান কাতেবিনের কাজ

কিরামান কাতেবিন বা সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ মানুষ ভালো-মন্দ যা ই করুক না কেন সবকিছুর হুবহু রেকর্ড করেন। যে শব্দটি মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে তা সাথে সাথে যথাযথভাবে সংরক্ষণ বা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন–

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

অর্থ : যখন গ্রহণকারী দুই ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে তার কার্যাবলি গ্রহণ করে সে যে কথাই উচ্চারণ করে, কিন্তু একজন অপেক্ষমান সদাপ্রস্তুত প্রহরী তার কাছে বিদ্যমান থাকে।

(সুরা ক্বাফ, ১৭-১৮)

ডানে ও বামে যে ফেরেশতা রিপোর্ট সংগ্রহ করেন তারা অতীব সম্মানিত। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে সংরক্ষক ফেরেশতাগণ, সম্মানিত লেখকবৃন্দ তারা জানেন তোমরা যা কর। (সুরা ইনফিতার, ১০-১২)।

তৃতীয় পাঠ

মুনকার ও নাকিরের পরিচয় ও দায়িত্ব

মুনকার ও নাকিরের পরিচয়

মুনকার (مُنْكَرٌ) ও নাকির (نَكِيْرٌ) দুজন ফেরেশতার নাম। যার অর্থ অপরিচিত ও বিকট চেহারাসম্পন্ন। মুনকার ও নাকির কবরে এসে মৃতব্যক্তিকে প্রশ্নকারী এমন দুজন ফেরেশতা যাদের অদ্ভুত চেহারা ও ভীতিপ্রদ গঠন অবয়বের কারণে এই রূপ নাম দেওয়া হয়েছে অথবা এ কারণে যে তারা উভয়ই মৃতব্যক্তির নিকট অপরিচিত।

মুনকার ও নাকির সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِذَا أُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَادَانِ اَرْزَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرُ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلُ مَنْ رَّبُّكَ وَمَادِيْنُكَ وَمَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ .

অর্থ : মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর কালো বর্ণের দেহবিশিষ্ট এবং নীল বর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট দুজন ফেরেশতা কবরে আগমন করে। এর একজনকে বলা হয় 'মুনকার' অপরজনকে বলা হয় 'নাকির'। তারা দু'জন রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে তার সামনে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবে–

مَنْ رَّبُّكَ؟ - তোমার রব কে?

مَا دِيْنُكَ؟ - তোমার দীন কী?

وَ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِى هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيْكُمْ - এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলেছিলে, যাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল? (জামে তিরমিযি ও মেশকাত)।

মৃতব্যক্তি যদি মুমিন হয়, তবে সে জবাব দেবে,

رَبِّى اللّٰهُ - আমার রব আল্লাহ।

دِيْنِى الْإِسْلَامُ - আমার দীন ইসলাম।

আর ইনি আল্লাহর প্রিয় হাবিব এবং তাঁর রসুল (ﷺ)।

তাদের চোখ বিজলির ন্যায় উজ্জ্বল, আওয়াজ বজ্রতুল্য এবং তাদের হাতে একটি লোহার ভারী হাতুড়ি থাকবে, যাকে হজের মৌসুম সমাগত সকল হাজিরা একত্রে মিলেও উত্তোলন করতে পারবে না। মুনকার ও নাকিরের উপর বিশ্বাস রাখা মৌলিক আকিদার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আযম আবু হানিফা (رحمه الله) বলেন- 'কবরে মুনকার ও নাকিরের প্রশ্ন ও দেহের মধ্যে রূহ এর পুনরায় ফিরে আসার কথা সঠিক, বহুসংখ্যক হাদিসের ভিত্তিতে আমরা এই বিশ্বাস করি যে, মুনকার ও নাকিরের প্রশ্ন করার বিষয়টি সত্য।' (কিতাবুল ওসিয়ত, পৃ. ২৩)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ফেরেশতাগণ কিসের তৈরি?

ক. আগুনের খ. পানির

গ. মাটির ঘ. নুরের

২। নবি-রসুলদের নিকট ওহি পৌঁছান কোন ফেরেশতা?

ক. জিবরাইল (আ.) খ. মিকাইল (আ.)

গ. ইসরাফিল (আ.) ঘ. আযরাইল (আ.)

৩। ফেরেশতাদের কাজ হচ্ছে

i. রসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপর দরুদ পড়া

ii. মুমিন বান্দাদের জন্য দোআ করা

iii. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

বাজারে যাওয়ার পথে রাস্তায় জামাল ও কামাল একজন লোককে পড়ে থাকতে দেখে। তারা লোকটিকে উঠিয়ে বসায় এবং তার খবরা-খবর জানতে চায়।

৪। জামাল ও কামালের কাজটি কোন ফেরেশতার কাজের সাথে মিল আছে?

ক. জিবরাইল (আ.) খ. মিকাইল (আ.)

গ. ইসরাফিল (আ.) ঘ. মুনকার-নাকির (আ.)

২০২৫

৫। জামাল ও কামালের অনুরূপ ফেরেশতারা কবরে জানতে চায় -

i. প্রতিপালক সম্পর্কে

ii. জীবন বিধান সম্পর্কে

iii. রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্পর্কে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নাসের একটি গার্মেন্টসে চাকরি করে। সুপার ভাইজারের অগোচরে সে কাজে ফাঁকি দেয়। গার্মেন্টসের অপর এক কর্মচারী জাফর তাকে বলে, প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন। তারা বান্দার সকল কাজকর্ম রেকর্ড করে থাকেন। তখন নাসের বলল, আমি কাজে ফাঁকি দিলেও আল্লাহ ও তাঁর রসুলের হুকুমমত ইবাদত বন্দেগি করি।

ক. ফেরেশতাদের একটি মৌলিক দায়িত্ব লেখ।

খ. মুনকার ও নাকির ফেরেশতার পরিচয় দাও।

গ. নাসেরের কাজ ও বক্তব্যকে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জাফরের বক্তব্যকে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়
কিতাবসমূহের প্রতি ইমান
اَلْأِيْمَانُ بِالْكُتُبِ

প্রথম পাঠ
আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমানের গুরুত্ব

আসমানি কিতাবের পরিচয়

মানব জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবি ও রসুল (ﷺ)গণের ওপর যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন সেগুলোকে আসমানি কিতাব বলা হয়। সকল কিতাবের ওপর ইমান আনা ফরয। মুমিন বা মুসলিম হবার জন্য যেমন সমস্ত নবি-রসুলের প্রতি ইমান আনা জরুরী, তেমনি সমস্ত আসমানি কিতাবের প্রতিও ইমান আনা অত্যাবশ্যকীয়। এটা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং মুত্তাকিদের মৌলিক গুণাবলির একটি। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের গুণাবলির বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন—

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ.

অর্থ : (মুত্তাকি তারা) যারা আপনার উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনে। (সুরা আল বাকারা, ০৪)।

আসমানি কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য

আসমানি কিতাবসমূহ নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

অর্থ : এ কিতাবকে আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, আপনি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন। (সুরা ইবরাহীম, ০১)

আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে আরো বলেন–

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ.

অর্থ : আমি এ কিতাবকে আপনার প্রতি সত্যসহ নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের মধ্যে আল্লাহর দেখানো সত্য জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়ে বিচার ফয়সালা করতে পারেন। (সুরা নিসা, ১০৫)

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে সঠিক ও নির্ভুল হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করা। যে হেদায়েত গ্রহণ করলে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কোনো জগতেই ভয় ও দুশ্চিন্তা কিছুই থাকবে না।

নাযিলকৃত কিতাবসমূহ

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হজরত আদম (আ.) হতে আরম্ভ করে সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) পর্যন্ত একশত চারখানা আসমানি কিতাব ও সহিফা নাযিল হয়েছে। এর মধ্যে চারখানা বড় কিতাব আর একশতখানা সহিফা বা পুস্তিকা নাযিল হয়েছে।

কুরআন মাজিদ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তেলাওয়াত ও লিপিবদ্ধকরণ রোহিত হয়ে গেছে। এমনকি কোনো কোনো আহকামও বাতিল হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সার নির্যাস কুরআন মাজিদে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সকল আসমানি কিতাবের উপর ইমান আনার ব্যাপারে ইসলাম যে আহ্বান জানিয়েছে তার কারণ হলো দুনিয়াতে প্রত্যেক জাতির নিকটই আল্লাহর নবি-রসুল এসেছেন তাঁর কিতাব নিয়ে। এসব কিতাবের বুনিয়াদি শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন। বলা হয়েছে আল্লাহর বন্দেগি কর এবং কুফর ও শিরক থেকে দূরে থাক। এ কারণেই মুসলিম ব্যক্তির এসব কিতাবের ওপর ইমান আনা ফরয।

দ্বিতীয় পাঠ

কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব

পবিত্র কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অনন্য বিশ্বকোষ। এ কিতাব একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান, সকল জিজ্ঞাসার জবাব, সকল প্রয়োজনের আয়োজন এই কুরআন মাজিদে রয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য চির কল্যাণকর পথ নির্দেশনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআন মাজিদে স্পষ্টভাবে প্রদান করেছেন। এ সকল হেদায়াত মানুষের জাগতিক, আত্মিক, মানসিক জ্ঞান ও কর্মক্ষেত্রে কল্যাণকর। বিশ্বজগতের সবকিছু এর মধ্যে বিবৃত আছে।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمٰوَاتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থ : আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কোনো অদৃশ্য বিষয় নেই যা কুরআন মাজিদে নেই।
(সুরা নামল, ৭৫)

কুরআন মাজিদে মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে এবং খাতামুন নাবিয়্যিন রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। বিদায় হজের সময় আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থ : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতা দান করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের জন্য পূর্ণতায় পৌঁছালাম, আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।
(সুরা মায়িদাহ, ৩)

স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই এই কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাই এতে কোনো তাহরিফ তথা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের অবকাশ নেই।

ভাষার অলংকার ও মাধুর্য এবং বর্ণনার স্বকীয়তা কুরআন মাজিদকে সকল গ্রন্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়ার অন্যতম কারণ। কুরআন فُرْقَانٌ বা হক বাতিলের পার্থক্যকারী গ্রন্থ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয় পাঠ
কুরআনের বিধান অস্বীকার করার পরিণাম

আল কুরআন আল্লাহর কালাম, চিরন্তন বাণী। লাওহে মাহফুযে নুরের ফলকে সংরক্ষিত। দীর্ঘ তেইশ বছরে, নুরের ফেরেশতা হজরত জিবরাইল (ﷺ)-এর মাধ্যমে, নুরানী কুরআন, নুরে মুজাস্‌সাম রসুলে আকরাম (ﷺ)-এর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে। এই কিতাব সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। বাতিল ইমান-আকিদাকে দূরীভূত করে, তাওহিদী আকিদাকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নাযিল হয়েছে এই কুরআন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

অর্থ : অবশ্যই এটা এক মহিমময় কিতাব, কোনো মিথ্যা এর সামনে থেকে বা পিছন থেকে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, এ এক প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত সত্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।
(সুরা ফুসসিলাত, ৪১)।

এই কুরআনের প্রতিটি বাক্য, শব্দ ও বর্ণকে মনে প্রাণে মেনে নেওয়াই হলো ইমানের দাবি। কিছু অংশ মেনে নিয়ে কিছু অংশ অস্বীকার করলে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা করেন–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থ : তোমরা কিতাবের কিছু অংশের উপর ইমান আনয়ন করে কিছু অংশ অস্বীকার করছো? তোমাদের মধ্যে যারা এ কাজটা করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে অপমান, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আর কিয়ামতের দিন তাদের কঠোর শাস্তির মাঝে নিপতিত করা হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে অনবহিত নন। (সুরা বাকারা, ৮৫)

কুরআনকে অস্বীকার করা কুফরি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনকে মুক্তির দিশারি হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়াই ইমান।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সকল আসমানি কিতাবের প্রতি ইমান আনার হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২। কোন কিতাবকে فرقان বা হক বাতিলের পার্থক্যকারী বলা হয়?

ক. তাওরাত খ. যাবুর

গ. ইঞ্জিল ঘ. কুরআন

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

i. অধিক তেলাওয়াত

ii. সঠিক পথ প্রদর্শন

iii. ইহ-পরকালীন মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

মামুন বলে, আল কুরআন মানুষের উপকারের জন্য নাযিল হয়েছে। তাই কুরআনের যে অংশ দিয়ে আমার উপকার হয়, আমি সে অংশ অনুসরণ করব।

৪। মামুনের বক্তব্যটি কোন পর্যায়ের?

ক. কুফুরি　　খ. নিফাকি

গ. ফুসুকি　　ঘ. বিদআতি

৫। মামুনের উচিত হচ্ছে-

i. সম্পূর্ণ কুরআন মাজিদ মান্য করা

ii. কুরআন মাজিদের উপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রাখা

iii. কুরআন মাজিদ বেশি বেশি তেলাওয়াত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

‘ক’ গ্রামের পাটওয়ারী ও হাওলাদার বংশের মধ্যে বংশমর্যাদা নিয়ে গণ্ডগোল এবং পরে মারামারি হয়। দ্বারিয়াপুর গ্রামের মেম্বার জনাব আব্দুল হক ‘ক’ গ্রামের পাটওয়ারী বংশের মাওলানা আব্দুল ওহাবকে বলেন, ‘তোমাদের গ্রামের বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেওয়া যায় না?’ পরবর্তীতে জনাব আব্দুল ওহাব অনেক চেষ্টায় দুই বংশের লোকজনকে একত্রিত করে কুরআনুল কারিমের আয়াত শুনান–

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰىكَ اللّٰهُ.

কিন্তু হাওলাদার বংশের আব্দুর রশিদ এক পর্যায়ে বললেন, তোমরা আমাদের বংশের উপর হাত তুলেছ, অপমান করেছ। আমরা তোমাদের সাথে নেই, এই বলে সকলকে নিয়ে চলে যান।

ক. কুরআন মাজিদ কাদের জন্য পথ প্রদর্শক?

খ. ‘কুরআন সকল আসমানী কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ’ ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব আব্দুল ওহাবের উদ্ধৃত আয়াত পরিস্থিতি অনুযায়ী কিরূপ? এর প্রয়োগ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হাওলাদার বংশের আব্দুর রশিদ এবং সকলের আচরণ তোমার ফিকহ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়
আখেরাতের প্রতি ইমান
اَلْإِيْمَانُ بِالْآخِرَةِ

প্রথম পাঠ
চিরস্থায়ী আখেরাত জীবনে মুক্তির আশা

আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী

আখেরাত (اَلْآخِرَةُ) অর্থ পরকাল বা মৃত্যু পরবর্তী জীবন। শরিয়তের পরিভাষায়, মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকাল যে জীবন চলতে থাকবে, তাকে আখেরাত বলে। কবর, হাশর, হিসাব, পুলসিরাত এবং জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। আখেরাতে বিশ্বাস মানবমনে সত্যের প্রতি আনুগত্য এবং অসত্য পরিহার করার আগ্রহ সৃষ্টি করে।

এখানে যেমন পুণ্যবানদের সুখ-শান্তির শেষ নেই, তেমনি অবিশ্বাসীদের দুঃখেরও শেষ নেই। আখেরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। যারা আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, সকল নবির যুগেই তারা কাফির বলে গণ্য হয়েছে।

আখেরাতে বিশ্বাস ইসলামের আকিদাসমূহের মধ্যে অন্যতম। আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া ইমান বিশুদ্ধ হয় না। কুরআন মাজিদে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

অর্থ : আর তারা পরকালের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। (সুরা বাকারা, ৫)

আখেরাতের বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মশীল করে তোলে। যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে না, দুনিয়ার জীবনই যার কাছে একমাত্র জীবন, যার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় নেই, সে যে কোনো পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে আখেরাতে বিশ্বাস মানুষকে পবিত্র রাখে।

প্রকৃতপক্ষে আখেরাতে বিশ্বাস ছাড়া তাওহিদ, রিসালাত ও কিতাবে বিশ্বাস করা হয় না। তাই মুমিন হওয়ার জন্য আখেরাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য।

আখেরাতে মুক্তির আশা

আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। পার্থিব জগতে যা কিছু আছে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

অর্থ : যমিনের উপর যা কিছু আছে, তা সবই ধ্বংসশীল। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধু আপনার রবের সত্তা, যিনি মহিমাময় মহানুভব। (সুরা আররহমান, ২৬-২৭)।

পরকালীন জীবনে মুক্তির উপায়

পরকালীন জীবনে মুক্তির উপায় হলো নির্ভেজাল ইমান এবং আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসুল (ﷺ)-এর প্রতি আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ মহব্বত। নাজাতের প্রথম শর্ত হলো ইমান । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا.

অর্থ : যথাযথ ইমান ঠিক রেখে যে ব্যক্তি নেককাজ করবে হোক সে পুরুষ কিংবা নারী তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র কমতি করা হবে না। (সুরা নিসা, ১২৪)।

নাজাতের অপর শর্ত হলো, কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। যেমন আল্লাহ বলেন–

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى.

অর্থ : আর যে ব্যক্তি স্বীয় রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, জান্নাতই হবে তার বাসস্থান। (সুরা নাযিআত, ৪০-৪১)।
তাই সহজেই আমরা বলতে পারি, আল্লাহর রহমত ও ইমানের সাথে নেক আমলই হলো আখেরাতে মুক্তির পথ।

দ্বিতীয় পাঠ
আমলনামা ও হাউযে কাউসার

আমলনামা বা কর্ম সংরক্ষণ রেজিস্টার

আমলনামা ফার্সি শব্দ। প্রত্যেক মানুষের সাথে দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা রয়েছেন, যারা দৈনন্দিন কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করে প্রতিবেদন লিখে থাকেন। ঐ লিখিত প্রতিবেদনকেই আমলনামা বলা হয়।

কোনো ব্যক্তি ভালো কাজ করার নিয়ত করার সাথে সাথেই ঐ নিয়তের সওয়াব লেখা হয় এবং কর্ম বাস্তবায়ন করার পর কর্মের দশ গুণ সওয়াব লেখা হয়। অপর পক্ষে মন্দ কাজ করার নিয়ত করলেও আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ঐ মন্দকর্ম সম্পাদন করার পূর্ব পর্যন্ত অবকাশ দেন। তার জন্য গুনাহ লেখা হয় না, যতক্ষণ না সে ঐ মন্দ কর্ম সম্পাদন করে।

হাশরের ময়দানে পুণ্যবান লোকদের আমলনামা ডান হাতের সম্মুখ দিক থেকে প্রদান করা হবে। অপরপক্ষে পাপী লোকদের আমলনামা বাম হাতে পিছন দিক হতে প্রদান করা হবে। অণু পরিমাণ আমলও হিসাব থেকে বাদ পড়বে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন−

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه.

অর্থ : কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে তাও সে দেখতে পাবে। (সুরা যিলযাল, ৭-৮)।

হাউযে কাউসার

হাউযে কাউসার (حَوْض كَوْثَر) নিয়ামতের কূপ। হাউয শব্দের অর্থ কূপ। আর কাউসার দ্বারা কুরআন মাজিদে অবারিত নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় রসুল (ﷺ)-কে যেসব নিয়ামত দান করেছেন, তন্মধ্যে হাউযে কাউসার অন্যতম।

আল্লাহ তাআলা বলেন−

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

অর্থ : হে নবি (ﷺ)! আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (সুরা কাউসার, ১)

আল্লাহ তাআলা রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে হাউযে কাউসার দান করেছেন। এ থেকে পিপাসার্ত মানুষকে পান করানো হবে। হাউযে কাউসারের মালিক রসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই। আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন−

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ) বলেন, আমার হাউয এক মাস অতিক্রম করার পথের সমান। তার চতুর্পাশ সমান। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা। তার সুগন্ধি মেশক থেকে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত। তার পান পেয়ালা আকাশের তারকার মতো অগণিত। যে একবার এ হাউয থেকে পান করবে সে কোনো দিন পিপাসার্ত হবে না। (বুখারি ও মুসলিম)

হাউযে কাউসার প্রিয়নবি (ﷺ)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার দেওয়া হয়েছে। হাশর ময়দানে এবং জান্নাতে আল্লাহর হাবিব (ﷺ) তাঁর প্রিয় উম্মতদেরকে এ হাউয থেকে পানি পান করাবেন, এ কথা বিশ্বাস করা ইমানের অঙ্গ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আখেরাত শব্দের অর্থ কী?

ক. কবরের যিন্দেগি খ. হাশরের যিন্দেগি
গ. পরকালীন জীবন ঘ. জান্নাতের জীবন

২. আমলনামা কী?

ক. নেক আমলের হিসাব খ. গুনাহের হিসাব
গ. কর্ম সংরক্ষণ রেজিস্টার ঘ. পার্থিব জীবনের রেজিস্টার

৩. পবিত্র কুরআনে কতটি আয়াতে আখেরাতের জীবন স্থায়ী হওয়ার কথা বলা হয়েছে?

ক. ৮০ টি খ. ৮১ টি
গ. ৮২ টি ঘ. ৮৩ টি

৪. নাজাতের অপর শর্ত হলো−

i. নেক আমল করা
ii. প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা
iii. বেশি বেশি যিকির করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

রাফী ও জামী বসে গল্প করছে। কিছু লোক একটি কফিন নিয়ে গোরস্থানের দিকে যাচ্ছে দেখে জামি বলল, লোকটির আখেরাতের যাত্রা শুরু হলো। চল আমরা জানাযায় যাই। রাফী বলল, ওসব অমূলক কথা। আখেরাত বলতে কিছুই নেই।

৫. জামীর কাজটি শরিয়তের বিধানে কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৬. রাফীর কাজটি কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে-

i. কুফুরি

ii. শিরকি

iii. মুনাফেকি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জাবের সাহেব মসজিদে ইমাম সাহেবকে আখেরাতের বিষয়ে আলোচনা করতে শুনলেন। আমলনামা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা শুনে খুব কাঁদলেন। সাদ্দাম তাকে বলল, কান্না থামাও তো; আলেমগণ এরূপই বলে থাকে। আসলে দুনিয়ার জীবনই শেষ।

ক. আমলনামা কী?

খ. 'আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী' বুঝিয়ে লেখ।

গ. সাদ্দামের মন্তব্য শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জাবেরের অবস্থা কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

২। ইরফান ও তাযকিয়া ভাই বোন। ইরফান মাদরাসায় পড়ে। সে ওস্তাদের কাছে আখেরাতে হাশরের ময়দানে পানির জন্য মানুষের ভীষণ কষ্টের কথা জানতে পেরে কাঁদছে। সে আরও শুনেছে আল্লাহর রসুল (ﷺ) একমাত্র মুমিন উম্মতকেই হাউযে কাউসারের পানি পান করাবেন। তাযকিয়া এ কথা শুনে বলল, আমার বান্ধবী আসমা বলছে দুনিয়াতে যেমন কাফির, মুশরিক পানি পায়, তেমনি আখেরাতেও পাবে; তাতে ভয়ের কিছুই নেই।

ক. হাউযে কাউসার কী?

খ. 'হাউযে কাউসারে বিশ্বাস ইমানের অঙ্গ' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

গ. আসমার কথাটি শরিয়তে কেমন? উল্লেখ কর।

ঘ. ইরফানের কাজটি কুরআন সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

নবম অধ্যায়

তাকদিরের প্রতি ইমান

اَلْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ

প্রথম পাঠ

তাকদিরের পরিচয় ও এর প্রতি বিশ্বাস

তাকদিরের পরিচয়

তাকদির (تَقْدِيْرٌ) আরবি শব্দ। এটি قَدْرٌ থেকে উৎকলিত। এর অর্থ হলো নির্ধারণ করা, পরিমাপ করা, যথাযথ হওয়ার ব্যবস্থা করা।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভালো-মন্দ, জীবন-মরণ, খাদ্য-পানীয়, মান-সম্মান সবই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। শরিয়তের পরিভাষায় এরূপ ভাগ্যলিপি বা বিধিলিপিকে তাকদির বলা হয়। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন–

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি সকল বস্তু নির্ধারিতরূপে বা পরিমাণমতো সৃষ্টি করেছি। (সুরা কামার, ৪৯)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا.

অর্থ : তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সে সবকে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।

(সুরা ফুরকান, ২)

সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় তথা ভালো-মন্দ, উপকার-অপকার ইত্যাদির স্থান-কাল এবং এসবের শুভ ও অশুভ পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত রয়েছে।

তাকদির বিশ্বাসের সুফল

তাকদিরের ওপর বিশ্বাস মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্ববহ। এ বিশ্বাস মুমিনকে তার মানবীয় বহু দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে। যেমন, মানুষ সফলতা অর্জন করলে আনন্দিত হয়, আবার ব্যর্থ হলে বিমর্ষ হয়। তাকদিরে বিশ্বাস মানুষকে উভয় প্রকার দুর্বলতা থেকে হেফাজত করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

অর্থ : পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে থাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষে এটি খুবই সহজ কাজ। তা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন তার কারণে হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সুরা হাদিদ, ২২-২৩)

তাকদিরে বিশ্বাসী মানুষ কঠিন থেকে কঠিনতর কোনো বিপদে পড়ে গিয়েও কখনো মনোবল হারায় না। তাকদিরে বিশ্বাস বান্দাকে সকল বিপদে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল করে তোলে।

দ্বিতীয় পাঠ

তাকদিরের উপর বিশ্বাস না করার পরিণাম

তাকদিরে বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অংশ। তাকদিরে অবিশ্বাস এমন গুরুতর অপরাধ যে, মুহাম্মদ (ﷺ) নিজেও তাদেরকে লানত করেছেন। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কেউ যদি আমার নির্ধারিত তাকদিরের উপর সন্তুষ্ট না থাকে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ না করে সে যেন আমি ছাড়া অন্য কাউকে রব বানিয়ে নেয়।

(মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক, মুসনাদু ইবনি আবি শায়বা)

হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন–

اَلْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ نِظَامُ التَّوْحِيْدِ فَمَنْ اٰمَنَ وَ كَذَبَ بِالْقَدْرِ فَقَدْ نَقَضَ لِلتَّوْحِيْدِ

অর্থ : আল্লাহর একত্ববাদ বিশ্বাসী হওয়া তাকদিরে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। কাজেই যে ব্যক্তি ইমান আনয়ন করল, কিন্তু তাকদিরকে অস্বীকার করলো প্রকৃতপক্ষে সে তাওহিদকেই প্রত্যাখ্যান করলো। (তরজুমানুস সুন্নাহ-৩/২৯)

তাই, প্রত্যেক মুমিনের উচিত তাকদিরে বিশ্বাস করা।

তাকদির ও তাদবির

তাকদিরে বিশ্বাস করা যেমন ইমানের অংশ তেমনি কাজ করে যাওয়াও আল্লাহ ও রসুল (ﷺ)-এর নির্দেশ। তাকদিরে বিশ্বাসের অর্থ সব কাজ পরিত্যাগ করে, হাত-পা গুটিয়ে ভাগ্যবাদী হয়ে বসে থাকা নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি দান করেছেন তা ব্যবহার করে কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে। কাজ করা বান্দার কর্তব্য, চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহর হাতে। তাই ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে সাধ্যানুযায়ী কাজ করে যাওয়াই ইসলামের নির্দেশ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তাকদিরের উপর ইমান আনার হুকুম কী?

ক. ফরজ　　খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত　　ঘ. মুস্তাহাব

২. কার পরিকল্পনা মোতাবেক সৃষ্টিজগত পরিচালিত হয়?

ক. ফেরেশতাদের　　খ. আল্লাহ তাআলার

গ. সরকার প্রধানদের　　ঘ. জনগণের

৩. আল্লাহ তাআলার ফয়সালা মোতাবেক হয়ে থাকে, মানুষের -

i. জীবনের স্থায়িত্ব

ii. ভালো-মন্দ

iii. জীবিকা নির্ধারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও iii　　ঘ. ii ও iii

মামুন বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে হতাশ হয়ে যায় এবং বলে, আমার আর পড়ালেখা করে লাভ নেই।

১. মামুনের মধ্যে ইমানের কোন বিষয়ের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়?

ক. আখেরাত   খ. হাশর

গ. মিযান   ঘ. তাকদির

২. এমতাবস্থায় মামুনের করণীয় হচ্ছে–

i. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখা

ii. পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া

iii. কোনো কাজে জড়িত হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক.i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আসিফ ও আশিক দাখিল সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সামনে বার্ষিক পরীক্ষা। আসিফ পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে, কিন্তু আশিক একটি মুহূর্তেও পড়ার টেবিলে না বসে বলছে, আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। আসিফ তাকে চেষ্টা করার পরে ভাগ্যের উপর নির্ভর করার পরামর্শ দেয়।

ক. التقدير শব্দের অর্থ কী?

খ. তাকদিরের গুরুত্ব বর্ণনা কর?

গ. আশিকের কাজটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে আলোচনা কর।

ঘ. আসিফের পরামর্শকে তুমি কি সঠিক মনে কর? প্রমাণ দাও।

২। গার্মেন্টস শ্রমিক সোহেল সাপ্তাহিক কাজ শেষে অনেকগুলো টাকা হাতে পেল। তখন অপর গার্মেন্টস শ্রমিক জুয়েল তাকে বলল, আজ তোমার ভাগ্য ভাল; তাই অনেকগুলো টাকা পেয়েছ। সোহেল জুয়েলকে বলল, আমি কষ্ট করে কাজ করেছি, তাই টাকা পেয়েছি আর তুমি বলছ আমার ভাগ্যের কারণে পেয়েছি !

ক. সকল ক্ষমতার মালিক কে?

খ. 'মানুষের কাজের ফলাফল আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হয়ে থাকে' ব্যাখ্যা কর।

গ. জুয়েলের বক্তব্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখা কর।

ঘ. সোহেল ও জুয়েলের বক্তব্যের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

দশম অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আকিদা

اَلْعَقِيْدَةُ حَوْلَ الصَّحَابَةِ

প্রথম পাঠ

সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি ও মর্যাদা

সাহাবা (اَلصَّحَابَةُ) শব্দটি আরবি। এ শব্দটি সাহাবি (اَلصَّحَابِيُّ)-এর বহুবচন। সাহাবি শব্দের অর্থ সঙ্গী, সাথী। পরিভাষায় সাহাবি বলা হয়–

هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ وَ مَاتَ عَلَى الْإِيْمَانِ.

অর্থ : যারা ইমান অবস্থায় নবি করিম (ﷺ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং মুমিন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন, তাদেরকেই সাহাবি বলা হয়। (কাওয়ায়িদুল ফিকহ, মুফতী আমীমুল ইহসান)

সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) ছিলেন দীনের আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ। নবি ও রসুলগণের পরই তাঁদের মর্যাদা। তাঁদের শান ও মান সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে অনেক আলোচনা রয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহাবায়ে কেরামের সত্যবাদিতা, তাদের যোগ্যতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

অর্থ : মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল, তার সাহাবিগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সাজদাবনত দেখতে পাবেন। তাঁদের মুখমণ্ডলে সাজদার চিহ্ন পরিস্ফুট থাকবে। (সুরা আল ফাতহ, ২৯)

আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের ইমানের দৃঢ়তা এবং পাপাচার থেকে মুক্ত থাকার আন্তরিক আগ্রহের কথা ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.

অর্থ : কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ইমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন, আর কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়, তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (সুরা হুজুরাত, ৭)

সাহাবাগণের মর্যাদা বর্ণনা করে রসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই ইরশাদ করেন–

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

অর্থ : আমার সাহাবিগণ নক্ষত্রের মতো, অতএব তাদের যাকেই অনুসরণ করবে হেদায়েতের পথ পেয়ে যাবে। (মেশকাত, ৫৫৪)

দ্বিতীয় পাঠ
সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সাহাবায়ে কেরামের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

অর্থ : মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম সারির এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এমন জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

(সুরা তাওবাহ, ১০০)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا تَسُبُّوْ اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَ لاَ نَصِيْفه.

অর্থ : আমার সাহাবিগণকে গালমন্দ করো না। কেননা আল্লাহর পথে তোমাদের কারো উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করেও কোনো সাহাবির এক মুদ (প্রায় একসের) বা তার অর্ধেক দানের সমতুল্য হবে না।

(সহিহ বুখারি/সুনানু আবি দাউদ)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

অর্থ : আমার সাহাবিদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে বিশেষভাবে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল বানিও না। তাদের প্রতি ভালোবাসা আমার প্রতি ভালোবাসারই প্রমাণ এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণেরই প্রমাণ। তাদেরকে যে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল অতি সত্তর তিনি তাকে পাকড়াও করবেন। (জামে তিরমিযি)

তৃতীয় পাঠ
সাহাবিগণ সমালোচনার ঊর্ধ্বে

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন- সাহাবিগণের মন্দ আলোচনা করা, খুঁত খুঁজে বের করা কারো জন্যই বৈধ নয়, বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اِخْتَارَنِىْ وَ اخْتَارَ لِىْ اَصْحَابِىْ فَجَعَلَ لِيْ مِنْهُمْ وَزَرَاءَ وَاخْتَانًا وَ اَصْهَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَلَا تَتَقَبَّلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّ عَدْلًا.

অর্থ : রিসালাতের জন্য আল্লাহ আমাকে নির্বাচন করেছেন এবং আমার সাহচর্যের জন্য সাহাবাদের নির্বাচন করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আমার উযির, কাউকে আমার জামাতা ও শ্বশুর নির্বাচন করেছেন। যারা তাদেরকে মন্দ বলবে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানবকুলের লানত নেমে আসবে, তাদের ফরয ও নফল কোনো আমলই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন না।
(আহকামুল কুরআন ও তাফসীরে কুরতুবি)।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِيْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللهِ عَلٰى شَرِّكُمْ.

অর্থ : তোমরা যদি কাউকে আমার সাহাবিদের মন্দ বলতে দেখ তাদের বলে দেবে তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্টতর তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। (মিশকাত, ৫৫৪)

(১) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বলেন- আমরা সাহাবায়ে কেরামের গুণ চর্চা ব্যতীত কখনো দোষ চর্চা করবো না।

(২) ইমাম মালিক (রহ.) বলেন- সাহাবিগণকে যারা হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে রসুলুল্লাহ (সা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা।

(৩) ইমাম তাহাভী (রহ.) বলেন- যারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে অথবা তাদের কুৎসা রটায় আমরাও তাদেরকে শত্রু বলে মনে করি। আমরা কেবল সাহাবায়ে কেরামের গুণ চর্চা করি দোষ চর্চা করি না।

সারকথা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের প্রতি কটূক্তি হতে বিরত থাকা ওয়াজিব। (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইফা)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সাহাবি শব্দের অর্থ হলো–

ক. দেশি খ. সঙ্গী
গ. সেবক ঘ. উপকারী

২। সাহাবিদের সম্মান করা–

ক. মুস্তাহাব খ. মুবাহ
গ. ওয়াজিব ঘ. মুস্তাহসান

৩। সাহাবিগণকে গালমন্দ করা–

i. মাকরুহ
ii. হারাম
iii. আল্লাহর লানতের কবলে পড়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

আঃ করিম ইতিহাস পড়তে গিয়ে সাহাবিদের মর্যাদার কথা জানতে পেরে আঃ রহিমকে বলল, বন্ধু সাহাবিদের নাম শুনে তা'যিম করতে হবে। তাঁদের সমালোচনা করা যাবে না। আঃ রহিম বলল, না এতে অসুবিধা নেই।

৪। আঃ করিমের কাজটির ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান কী?

ক. ফরজ   খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত   ঘ. মুস্তাহাব

৫। আঃ রহিমের কর্তব্য হলো -

i. তওবা করা

ii. ইস্তেগফার করা

iii. সাহাবিদের তা'যিম করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. iii   ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ইকরাম ও ইসহাক মাদ্রাসায় পড়ে। আকাইদ ও ফিক্হ ক্লাসে শিক্ষক সাহাবিদের প্রশংসা, তা'যিম করলেন। ছাত্রদের তা'যিম করতে নসিহত করলেন। ইকরাম সাহাবিদের সমালোচনা করে তা'যিম করে না। বরং বলে তা'যিমের প্রয়োজনীয়তা কী?

ক. সাহাবিদের তা'যিম করার হুকুম কী?

খ. সাহাবিদের তা'যিম কেন করতে হবে? বুঝিয়ে লেখ

গ. ইকরামের কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন? বর্ণনা কর।

ঘ. ওস্তাদের কাজটি কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় ভাগ

আল ফিকহ

اَلْفِقْهُ

প্রথম অধ্যায়
ইলমে ফিকহের ইতিহাস
تَارِيْخُ عِلْمِ الْفِقْهِ

প্রথম পাঠ
ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ফিকহ (اَلْفِقْهُ) শব্দের অর্থ জানা, বোঝা, উপলব্ধি করা, বিচক্ষণতা, অনুধাবন করা, সুক্ষ্মদর্শিতা অর্জন করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ফিকহ হলো–

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالَـهَا وَمَاعَلَيْهَا

অর্থ : কল্যাণকর ও ক্ষতিকর ব্যাপারে আত্ম উপলব্ধিকে ফিকহ বলে। (কাওয়াইদুল ফিকহ, পৃ. ৪১৪)

কুরআন মাজিদে ফিকহ ফিদদীন অর্জন করার তাগিদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ.

অর্থ : ইমানদারদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একটি ক্ষুদ্রদল কেন দীনের সুক্ষ্ম জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে না। (সুরা তওবা, ১২২)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাঁকে দীনের ফিকহ বা সুক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন। (সহিহ বুখারি)

প্রিয়নবি (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، وَعِمَادُ هٰذَا الدِّينِ الْفِقْهُ.

অর্থ : প্রত্যেক বস্তুরই খুঁটি রয়েছে, আর দীনের খুঁটি হল ফিকহ। (মুজামুল আওসাত ও তাবরানী)

কুরআন ও হাদিসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তাসম সুক্ষ্মজ্ঞানসমূহকে বিন্যস্ত করে আমলের উপযোগী করার জন্য ইলমে ফিকহের বিকল্প নেই। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে কোনটি গ্রহণীয় আর কোনটি বর্জণীয় তা কুরআন সুন্নাহ থেকে আহরণ করে যাবতীয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে যিনি যুগজিজ্ঞাসার আলোকে সমাধান পেশ করতে সক্ষম, তাকে ফকিহে মুজতাহিদ (فَقِيْهٌ مُجْتَهِدٌ) বলা হয়।

প্রিয়নবি (ﷺ)-এর যুগে শরয়ি জিজ্ঞাসার জবাব তিনি নিজেই দিতেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামের যুগে ফিকহি মাসয়ালার সমাধানের জন্য ফকিহ সাহাবাগণের বোর্ড ছিল, যারা সঠিক মাসয়ালা পেশ করতেন। যার ফলে ইসলামে সর্বকালের সর্বযুগের সমাধান এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যার গ্রহণযোগ্যতা সকল যুগে সমভাবে বিদ্যমান।

দ্বিতীয় পাঠ
মাযহাবের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

মাযহাব (مَذْهَبٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মত, পথ, দল ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ফকিহ ইমামগণ চিন্তা-গবেষণা করে মাসয়ালা নির্ধারণের ব্যাপারে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন ও বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন, তার প্রতিটি পৃথক পৃথক সমষ্টিকে মাযহাব বলে।

ইসলামের যে সব মৌলিক বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে সে সকল ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে কোনো দ্বিমত বা মতপার্থক্য নেই। তবে মতপার্থক্য রয়েছে শরিয়তের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে। আর এ মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কারণ ইসলাম মৌলিক বিষয় ঠিক রেখে স্বাধীন, মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে সমর্থন ও উৎসাহিত করেছে।

ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ি, মালেক ও আহমদ বিন হাম্বল (رحمهم الله) ছিলেন ঐসকল ভাগ্যবান ব্যক্তিদের সর্বশীর্ষে, যাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন কুরআন-সুন্নাহর গভীর গবেষণায়। যার ফলাফল মুক্তামালার ন্যায় সাধারণ মানুষের নিকট উপস্থাপিত হয়। উক্ত ইমামগণের গবেষণার মৌলিক দর্শন ও সমস্যাবলির সমাধানগুলোই মূল চার মাযহাবে বিন্যস্ত।

মৌলিকভাবে কুরআন ও হাদিসের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য না থাকলেও এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে এবং বর্ণনা ও নির্ভরযোগ্যতায় ইমামদের মতপার্থক্যের কারণ থেকেই বিভিন্ন মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তীতে ঐ ইমামগণের নামানুসারে মাযহাবসমূহের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি, হাম্বলি ইত্যাদি।

মাযহাব গ্রহণ করার বিধান

যিনি নিজে মুজতাহিদ নন, এমন ব্যক্তির জন্য এ চার মাযহাবের যে কোনো একটিকে অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর যিনি ফকিহে মুজতাহিদ (فَقِيْهٌ مُجْتَهِدٌ) তথা কুরআন সুন্নাহ, ইজমা, যুগের অবস্থা গবেষণা করে যে কোনো বিষয়ে কুরআন সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে নিজে রায় দিতে সক্ষম তার জন্য অন্য কারো মাযহাব গ্রহণের প্রয়োজন নেই। যেমন, ইমাম বুখারি (রহ.) নিজেই ছিলেন ফকিহে মুজতাহিদ। ফকিহে মুজতাহিদ না হয়ে যারা সরাসরি কুরআন ও হাদিস থেকে জ্ঞান অর্জন করে আমল করার চেষ্টা করেন, তাদের সিদ্ধান্তে ভুল থাকার অবকাশ রয়েছে।

তৃতীয় পাঠ
ইমামগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(ক) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

নাম- নুমান, উপনাম আবু হানিফা, উপাধি- ইমামে আযম (اَلْإِمَامُ الْاَعْظَمُ), পিতার নাম-সাবিত। তিনি ইরাকের কুফা নগরীতে ৮০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন বিশিষ্ট তাবেয়ি। তিনি রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবি হজরত আনাস (রা.)সহ কয়েকজন সাহাবির সান্নিধ্য লাভ করেন। ইতিহাস প্রণেতাগণ চারজন সাহাবির সাথে তার সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তার নাম অনুসারেই এ মাযহাবকে হানাফি মাযহাব বলা হয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)–কে ইসলামি ফিকহের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি এক হাজার বিজ্ঞ আলেমের সমন্বয়ে একটি ফিক্হ বোর্ড গঠন করেন, এর শীর্ষভাগে ছিলেন তাঁরই ৪০ জন সুদক্ষ ছাত্র। তাঁরা দীর্ঘ ২২ বছর কঠোর পরিশ্রম করে ইলমে ফিকহের রূপ দান করেন। এই ফিকহ বোর্ড ৯৩ হাজার মাসয়ালা লিপিবদ্ধ করে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নিজে তার মাযহাবের নাম দিয়ে যাননি। তাঁর নিয়ম-নীতি অবলম্বন করে তাঁর ছাত্রগণের অসামান্য ইলমি খেদমতের ফলে ইলমে ফিকহের যে ধারার সৃষ্টি হয় তা হানাফি মাযহাব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি মুসলিম বিশ্বে ইমামে আযম নামে পরিচিত।

ইলমে হাদিসের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) অনেক অবদান রয়েছে। মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা (مُسْنَدُ اِمَامِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ) নামক গ্রন্থ তাঁর মহান কীর্তি বহন করে। তিনিই সেই মহান ব্যক্তি যিনি কিতাবুল আসার (كِتَابُ الْاٰثَارِ) নামে সর্বপ্রথম হাদিসের সংকলন করেছেন। মোল্লা আলি কারী (رحمه الله) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সামাআ (رحمه الله)-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন, ইমাম আযম আবু হানিফা (رحمه الله) তাঁর স্বীয় রচনাবলিতে ৭০ হাজারের বেশি হাদিস বর্ণনা করেন এবং ৪০ হাজার হাদিস থেকে তিনি কিতাবুল আসার গ্রন্থিত করেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থ আল ফিকহুল আকবর (اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ) ইসলামি আকাইদ বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে সমগ্র বিশ্বে বিশেষভাবে সমাদৃত।

ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) অত্যন্ত জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান যুক্তিবাদী মনীষী ছিলেন। তিনি প্রধানত কুরআনকেই গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কোনো হাদিসের নির্ভরযোগ্যতার ওপর নিশ্চিত হতে না পারলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। তিনিই প্রথম আইন প্রণয়নে ইজমা ও কিয়াসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্তমানে পৃথিবীর সবচাইতে বেশি মুসলমান এই মাযহাবের অনুসরণ করে।

ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) রাষ্ট্রীয় প্রধান কাজি (চীফ জাস্টিস)-এর পদ প্রত্যাখ্যান করায় খলিফা মানসুরের রোষানলে পড়ে ১৪২ হিজরিতে কারারুদ্ধ হন। অতঃপর কারাগারে গোপনে বিষ প্রয়োগের ফলে ১৫০ হিজরি ১২ জমাদিউল উলা মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে কারাগারেই শাহাদাত বরণ করেন। তাকে খিযরান নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

(খ) ইমাম মালিক (رحمه الله)

নাম- মালিক, উপনাম–আবু আবদুল্লাহ, উপাধি- ইমামু দারিল হিজরত, পিতা- আনাস ইবনে মালিক ইবনে আবু আমের (رحمه الله)। তিনি ৯৩ হিজরিতে মদিনা তায়্যিবায় জন্মগ্রহণ করেন।

তিনিই মালেকি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাল্যকাল থেকেই কুরআন ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশিষ্ট জ্ঞানি-গুণিদের মধ্যে স্থান লাভ করেন। তিনি বুখারি ও মুসলিম শরিফেরও পূর্বে হাদিস শাস্ত্রের প্রথম বিশুদ্ধ গ্রন্থ মুআত্তা সংকলন করেন, যা উম্মুস সহিহাইন বা বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফের জননী নামে খ্যাত। এই কিতাবটি ‘মুআত্তা মালিক’ (اَلْمُؤَطَّا لِاِمَامِ مَالِكٍ) নামে পরিচিত। প্রায় ১,৭০০ হাদিস এতে স্থান পেয়েছে।

মিসর, স্পেন, ইরাক, মরক্কো, জর্দান ও উত্তর আফ্রিকাতে মালেকি মাযহাবের অনেক অনুসারী রয়েছে। আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করার কারণে তাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। অবশেষে ১৭৯ হিজরি ১১ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৭৯৫ খ্রি. জুন মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। মদিনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

(গ) ইমাম শাফেয়ি (رحمه الله)

নাম- মুহম্মদ, উপনাম- আবু আবদুল্লাহ, পিতার নাম- ইদরিস, মাতার নাম- উম্মুল হামযা। তার পূর্ব পুরুষ শাফেয়ির নামানুসারে তিনি শাফেয়ি নামে পরিচিতি লাভ করেন। ইমাম শাফেয়ি (رحمه الله) ১৫০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাত বছর বয়সে কুরআন মাজিদ হিফজ করেন। দশ বছর বয়সে মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক মুখস্থ করেন। পনেরো বছর বয়সে তিনি তাফসির, হাদিস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করলে উস্তাদগণ তাকে ফতোয়া দানের সনদ দেন। তিনি অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। ইমাম মালিক (رحمه الله) ও ইমাম মুহাম্মদ (رحمه الله) তার শিক্ষক ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ি (رحمه الله) ফিকহশাস্ত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর নাম অনুসারে এ মাযহাবকে শাফেয়ি মাযহাব বলা হয়। তিনিই এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা।

উসূলে ফিক্‌হের মৌলিক নীতিমালা ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله), ইমাম মালিক (رحمه الله), ইমাম আবু ইউসুফ (رحمه الله), ইমাম মুহাম্মদ (رحمه الله) নির্ধারণ করলেও একটি মৌলিক ও স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে উসূলে ফিকহ (أُصُوْلُ الْفِقْهِ) শাস্ত্রের তিনিই স্থপতি। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম তিনি 'আর-রিসালা' (اَلرِّسَالَةُ) নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইমাম শাফেয়ি (رحمه الله) ফিকহশাস্ত্রের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তার মধ্যে কিতাবুল উম্ম (كِتَابُ الْأُمِّ) অন্যতম। তার উদ্ভাবিত মাযহাব হানাফি ও মালেকি মাযহাবের মাঝামাঝি পন্থা। ইলমে হাদিসে তার দক্ষতার জন্য ইরাকের আলেমগণ তাকে نَاصِرُ السُّنَّةِ বা হাদিসের সহায়ক উপাধিতে ভূষিত করেন।

হিজরি ২০৪ সনের রজব মাসের শেষ দিন মোতাবেক ৯২০ খ্রি. ২০ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মিসরের ফুসতাতে ৫৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মিসরের ফুসতাতে তার মাজার রয়েছে।

(ঘ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله)

নাম- আহমদ, উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি- শায়খুল ইসলাম ও ইমামুস সুন্নাহ। পিতার নাম- মুহাম্মদ, দাদার নাম- হাম্বল।

ইমাম আহমদ (رحمه الله) ১৬৪ হিজরির রবিউল আউয়াল মাস মুতাবেক ৭৮০ ইসায়ি সনের নভেম্বর মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। দাদার নামানুসারে তার মাযহাবের নাম হয় হাম্বলি। তিনি প্রথম জীবনে বাগদাদ নগরেই কুরআন, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি গভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে কুফা, বসরা, মক্কা, মদিনা, ইয়ামেন, সিরিয়া এবং আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে গমন করে কুরআন, হাদিস ও ফিকহ বিষয়ক সুক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ৮ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করে ৩০ হাজার সহিহ হাদিসের সমন্বয়ে 'মুসনাদ' গ্রন্থ সংকলন করেন, যা মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল (مُسْنَدُ اَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ) নামে পরিচিত। তিনি ২৪১ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল ৭৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বাগদাদেই তাকে সমাহিত করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। اَلْفِقْهُ শব্দের অর্থ কী?

ক. অনুধাবন করা খ. জ্ঞানার্জন করা
গ. পাণ্ডিত্য লাভ করা ঘ. গবেষণা করা

২। প্রসিদ্ধ ইমাম কতজন?

ক. দুইজন খ. তিনজন
গ. চারজন ঘ. পাঁচজন

৩। اَلْإِمَامُ الْأَعْظَمُ (ইমামে আযম) কার উপাধি?

ক. ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله)
খ. ইমাম শাফেয়ি (رحمه الله)
গ. ইমাম মালেক (رحمه الله)
ঘ. ইমাম আহমদ (رحمه الله)

৪। মানবজীবনে عِلْمُ الْفِقْهِ-এর প্রয়োজন, কারণ এতে -

i. জীবনের সকল সমাধান পাওয়া যায়
ii. কুরআন হাদিসের সম্পূর্ণ অনুসরণ হয়
iii. জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

জামাল সাহেব একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তিনি বলেন, কুরআন ও হাদিস থাকতে মাযহাবের প্রয়োজন কি?

৫। জামাল সাহেবের বক্তব্যটি কিসের পরিচয় বহন করে?

ক. অজ্ঞতা খ. দক্ষতা
গ. বিচক্ষণতা ঘ. বাকপটুতা

৬। জামাল সাহেবের উচিত হচ্ছে -

i. ইজতিহাদ করা

ii. তাকলিদ করা

iii. ইলমে ফিক্‌হ মানা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

শফিক একটি মাসয়ালার সমাধানের জন্য ফিকহের কিতাব খোঁজ করে। তার বন্ধু আসিফ এ দৃশ্য দেখে বলে, যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন হাদিস খোঁজ করা উচিত। শফিক তার বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলল, কুরআন হাদিসের গবেষণালব্ধ সমাধান আছে ইলমে ফিকহের মধ্যে।

ক. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আসল নাম কী?

খ. فَقِيْهٌ مُجْتَهِدٌ (ফকিহ মুজতাহিদ) বলতে কী বোঝ?

গ. আসিফের বক্তব্যটি ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

ঘ. শফিকের উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নাজাসাত
اَلنَّجَاسَةُ

প্রথম পাঠ
নাজাসাত পরিচিতি ও প্রকারভেদ

নাজাসাত (نَجَاسَةٌ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ অপবিত্রতা, নাপাকি, ময়লা, নোংরা, মলিনতা। এটি তাহারাত (طَهَارَةٌ)-এর বিপরীত শব্দ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নাজাসাত বলতে এমন বস্তুকে বোঝায়, যাকে শরিয়ত অপবিত্র বলে জানিয়েছে তা পরিহার করা এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলা। যেমন : মল-মূত্র, রক্ত ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অপবিত্র অবস্থায় এ সকল ইবাদত কবুল হয় না। সালাত, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, কুরআন স্পর্শ প্রভৃতি ইবাদতের জন্য শরীর, পোশাক ও ইবাদতের স্থানকে নাজাসাতমুক্ত রাখা শর্ত।

নাজাসাত (نَجَاسَةٌ) প্রধানত দু প্রকার। যথা–

(ক) নাজাসাতে হাকিকি (نَجَاسَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ) বা প্রকৃত নাপাকি

(খ) নাজাসাতে হুকমি (نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ) বা বিধানগত নাপাকি

(ক) নাজাসাতে হাকিকির পরিচিতি :

نَجَاسَةٌ শব্দের অর্থ নাপাকি আর حَقِيْقِيَّةٌ-এর অর্থ প্রকৃত, বাস্তব। নাজাসাতে হাকিকি বলতে নাপাকির এমন এক অবস্থা বোঝায়, যা দেখা যায় এবং যা সাধারণত মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে এবং যে সব নাপাকি থেকে মানুষ নিজের শরীর, জামাকাপড় ও সমস্ত ব্যবহার্য জিনিসপত্র রক্ষা করতে চায়। যেমন : পেশাব, পায়খানা, রক্ত, মদ ইত্যাদি।

ইসলামি শরিয়ত এসব থেকে দূরে থেকে পাক-পবিত্র থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

(খ) নাজাসাতে হুকমির পরিচিতি

نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ-এর অর্থ বিধানগত নাপাকি। যে সব অপবিত্রতা প্রকাশ্যে দেখা যায় না কিন্তু ইসলামি শরিয়ত এগুলোকে অপবিত্র হিসেবে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, সেগুলোকে نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ বলা হয়। যেমন : অজুবিহীন অবস্থায় থাকা, গোসলের প্রয়োজন হওয়া।

নাজাসাতের বিধান

উভয় প্রকার নাজাসাতের হুকুম হচ্ছে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী তা থেকে পবিত্র হতে হবে। অপবিত্র অবস্থায় থাকা কোনো মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না। অজু ছাড়া সালাত আদায় ও কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়। তাই নাজাসাত থেকে পবিত্র থাকা ইমানি দায়িত্ব।

নাজাসাতে হাকিকির প্রকার

নাজাসাতে হাকিকি আবার দু প্রকার। যথা–

(ক) اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ (কঠিনতর অপবিত্রতা)।

(খ) اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ (সহজতর অপবিত্রতা)।

اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ-এর পরিচয় ও হুকুম

যে সকল নাপাক বা অপবিত্র হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং সন্দেহাতীতভাবে অপবিত্র, সেগুলোকে নাজাসাতে গালিজা বলে। যেমন : পেশাব, পায়খানা, প্রবাহিত রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি।

এ প্রকারের নাজাসাত শরীরে অথবা কাপড়ে লেগে থাকলে, তা পাক না করলে সালাত জায়েয হবে না, (শরয়ি ওযর থাকলে ভিন্ন কথা)। শরয়ি ওজর বলতে এমন সময় বা স্থানে শরীরে নাপাক লাগাকে বোঝায়, যা পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা নেই বা নাপাক লাগা কাপড় ছাড়া বিকল্প কাপড় নেই। এ অবস্থায় নাপাক লেগে থাকলেও তা নিয়ে সালাত আদায় করতে হবে।

اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ-এর পরিচয় ও হুকুম

যে সকল বস্তু অপবিত্র হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়, অপেক্ষাকৃত হালকা ও সহজতর, সেগুলোকে নাজাসাতে খফিফা বলে। যেমন : হালাল প্রাণীর পেশাব, হারাম পাখির মল ইত্যাদি।

এ জাতীয় অপবিত্রতা শরীর বা কাপড়ের কোনো অংশের এক চতুর্থাংশ স্থানে লাগলে বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে তা নিয়ে সালাত আদায় করা জায়েয হবে। প্রকাশ থাকে যে, নাপাকি যত সামান্য হোক না কেন বিনা ওজরে তা নিয়ে সালাত আদায় করা উচিত নয়।

নাজাসাতে গালিজার একটি তালিকা

১. শূকর ও কুকুরের প্রতিটি বস্তুই নাজাসাতে গালিজা।

২. মানুষের পেশাব-পায়খানা।

৩. মানুষ অথবা পশুর রক্ত।

৪. বমি (যে কোনো বয়সের মানুষের হোক)

৫. ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত বা পুঁজ অথবা অন্য কোনো তরল পদার্থ।

৬. যে সব পশুর ঝুটা নাপাক তাদের ঘাম ও লালা।

৭. যবেহ ছাড়া মৃত পশুর গোশত ও চর্বি।

৮. নাপাক বস্তু থেকে নির্গত নির্যাস।

৯. মদ ও এ জাতীয় অন্যান্য মাদক দ্রব্য।

নাজাসাতে খফিফার একটি তালিকা

১. হালাল পশুর পেশাব। যেমন : গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি।

২. হারাম পাখির মল। যেমন : কাক, চিল, বাজ। কিন্তু বাদুরের পেশাব পায়খানা পাক।

৩. ঘোড়ার পেশাব।

৪. হালাল পাখির পায়খানা যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

৫. নাজাসাতে খফিফা যদি নাজাসাতে গালিজার সাথে মিশে যায় তাহলে নাজাসাতে গালিজার পরিমাণ যত কমই হোক বা বেশি হোক তখন সব নাজাসাতে গালিজা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পাঠ
নাজাসাতযুক্ত পানির বিধান

(ক) নাপাক পানি : যেমন : প্রবাহমান পানিতে নাপাকি পড়ে যদি পানির মৌলিক বৈশিষ্ট্য রঙ, স্বাদ ও গন্ধ বদলে ফেলে, তবে তা নাপাক বলে গণ্য হবে। আবদ্ধ অনেক পানি কিন্তু নাপাকি পড়ার কারণে পানির রং স্বাদ ও গন্ধ বদলে গেছে অথবা আবদ্ধ পানিতে নাজাসাত পড়েছে কিন্তু তার দ্বারা পানির রং, স্বাদ ও গন্ধে কোনো পরিবর্তন আসেনি, সে সব পানি দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয নয় এবং তা দিয়ে কোনো নাপাক বস্তু পবিত্র করা যাবে না।

(খ) মাশকুক বা সন্দেহযুক্ত পানি : এমন পানি যা দিয়ে অজু গোসল জায়েয হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ আছে। যেমন যে পানিতে গাধা বা খচ্চর মুখ দিয়েছে। মাশকুক পানির হুকুম এই যে, এ পানি দিয়ে অজু করার পর তায়াম্মুম করতে হবে। (তাহতাবী)

(গ) স্রোতের পানিতে যদি নাজাসাত পড়ে এবং তাতে পানির রং স্বাদ ও গন্ধে পরিবর্তন দেখা না দেয় তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয। বড় পুকুর বা দীঘি যার একদিকে পানি নাড়া দিলে অন্য দিকে নড়ে না এ ধরনের পুকুরের এক দিকে নাপাকি পড়লে অন্য দিকের পানি দিয়ে তাহারাত হাসিল করা জায়েয।

পবিত্র পানিতে ব্যবহৃত পানি মিশে গেলে এবং ব্যবহৃত পানি পরিমাণে বেশি হলে সমস্ত পানিই ব্যবহৃত পানি বলে গণ্য হবে এবং তা দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয হবে না।

তৃতীয় পাঠ
কয়েকটি নাজাসাত (নাপাক) প্রাণী

আল্লাহ তাআলা পশু, পাখি ও প্রাণী জগতের বহুপ্রজাতিকে মানুষের জন্য হালাল করেছেন এবং কোনো কোনো প্রাণীকে হারাম করেছেন।

যেসকল প্রাণী হালাল করেছেন :

আল্লাহ তাআলা যে সকল প্রাণী হালাল করেছেন, তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১। জলচর প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মাছ হালাল। মাছ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীই হালাল নয়।

২। স্থলচর প্রাণীর মধ্যে গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু হালাল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.

অর্থ : চতুস্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য এতে শীত নিবারক উপকরণ ও অনেক উপকার রয়েছে। এ থেকে তোমরা আহার করে থাকো। (সুরা নাহল, ৫)।

এ সকল প্রাণীর মধ্যে রয়েছে গরু, মহিষ, উট, হরিণ, ভেড়া ইত্যাদি।

যেসকল প্রাণী হারাম করেছেন :

আল্লাহ তাআলা যে সকল প্রাণী হারাম করেছেন,উহার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১। দন্ত দিয়ে শিকারকারী হিংস্র জন্তু এবং নখ দিয়ে শিকারকারী প্রাণী খাওয়া জায়েয নয়। যেমন : বাঘ, সিংহ, চিতা, বানর, ভাল্লুক, হাতি, শিয়াল, বিড়াল ইত্যাদি।

পাখির মধ্যে ঈগল, বাজ, শকুন, চিল, কাক ইত্যাদি। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে সাপ, গুই সাপ, বেজী, ইঁদুর, চিকা, বাদুর, কচ্ছপ ইত্যাদি।

২। কুরআন মাজিদে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে–

(ক) মৃত জন্তু

(খ) শুকরের মাংস

(গ) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত জন্তু।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নাজাসাত প্রধানত কয় প্রকার?

ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

২। নিচের কোনটি নাজাসাতে গালিজার উদাহরণ?

ক. গরুর পেশাব খ. বাদুরের পেশাব
গ. ঘোড়ার পেশাব ঘ. মানুষের পেশাব

৩। কোন পাখির গোশত খাওয়া হালাল?

ক. ঈগল খ. চিল
গ. কাক ঘ. কবুতর

৪। কুরআন মাজিদে হারাম করা হয়েছে -

i. মৃত প্রাণী

ii. শুকরের গোশত

iii. হরিণের গোশত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

জামিলা বেগমের কাপড়ে তার ছেলে বমি করে। তিনি সেগুলো মুছে ঐ কাপড় দিয়ে সালাত আদায় করেন।

৫। জামিলা বেগমের সালাত কেমন হয়েছে?

ক. صَحِيْحٌ খ. بَاطِلٌ

গ. فَاسِدٌ ঘ. مَكْرُوْهٌ

৬। এ মুহূর্তে জামিলা বেগমের করণীয় ছিল -

i. কাপড় পরিবর্তন করা

ii. গোসল করে পবিত্র হওয়া

iii. বমি ভালভাবে পরিষ্কার করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

লতিফ সাহেব শীতকালে ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশ্যে বের হন। মাগরিবের সালাতের আযান হলে সদরঘাট থেকে লঞ্চ ছেড়ে দেয়। তিনি অজু করার জন্য নিচে নেমে দেখেন পানি অত্যন্ত কালো ও দুর্গন্ধযুক্ত। তিনি নিরুপায় হয়ে ঐ পানি দিয়ে অজু করার সিদ্ধান্ত নিলে আবদুর রহিম সাহেব তাকে বললেন, আপনি অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে পারেন।

ক. নাজাসাতে খফিফার একটি উদাহরণ দাও।

খ. نَجَاسَةٌ غَلِيْظَةٌ বলতে কী বোঝায়?

গ. লতিফ সাহেবের সিদ্ধান্তটি কেমন? ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আব্দুর রহিম সাহেবের মতামতটির যৌক্তিকতা নিরূপণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়
তাহারাত
اَلطَّهَارَةُ

প্রথম পাঠ
পবিত্রতা অর্জন ও পবিত্রকরণ

(ক) চামড়া পবিত্র করার নিয়ম

চামড়া একটি জরুরী বস্তু। তা দিয়ে জুতা, ব্যাগসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি হয়। চামড়া শুধু পানি দিয়ে ধৌত করলে পাক হয় না। হালাল পশু বা হারাম পশু কিংবা তৃণভোজী পশু অথবা হিংস্র যে কোনো পশুর চামড়াও দাবাগাত করার পর পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু মজ্জাগত নাপাক যেমন শুকর যা কোনোদিন কোনোভাবেই পাক হয় না। তার চামড়াও কোনোরূপে পাক করা যায় না। হালাল পশু যেমন উট, মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এ সবের চামড়া পশু যবেহ করার পরই তা পবিত্র হয়ে যায়, দাবাগাত করা শর্ত নয়। চামড়াতে লবণ মিশিয়ে চামড়া পরিশোধন পাউডার লাগিয়ে তার চর্বি ফেলে দিয়ে তাকে ব্যবহার উপযোগী করার নাম দাবাগাত। কোনো নাপাক জিনিস দিয়ে চামড়া দাবাগাত করা হলে তা তিনবার ধুয়ে ফেললেই পাক হয়ে যায়।

(খ) জমাট বস্তু

জমাট হওয়া ঘি, চর্বি অথবা মধুর কোনো অংশে নাপাকি পড়ার কারণে নাপাক হয়ে গেলে, নাপাক অংশটুকু বাদ দিলেই তা পাক হয়ে যায়। সানা আটা অথবা শুকনো আটাও একই হুকুম। যেমন : সানা আটার উপর যদি কুকুর মুখ দেয় তাহলে যে অংশে কুকুরের লালা লেগেছে সে অংশটুকু ফেলে দিলেই বাকিটা পাক হয়ে যাবে। মোটকথা, জমাট হওয়া অংশের মধ্যে নাপাক লাগা অংশটুকু ফেলে দিলেই বাকি অংশ পাক হয়ে যাবে।

(গ) তৈলাক্ত জিনিস

তৈল অথবা ঘি যদি নাপাক হয় তাহলে তৈল বা ঘিয়ে সমপরিমাণ পানি ঢেলে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। পানি শুকিয়ে যাবার পর পুনরায় ঐ পরিমাণ পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। এভাবে তিনবার করলে তা পাক হয়ে যাবে। অথবা তৈল বা ঘি এর মধ্যে পানি দিতে হবে এভাবে যখন পানির উপর তৈল বা ঘি তখন তা উপর থেকে তুলে নিয়ে আবার পানি ঢালতে হবে। এভাবে তিনবার করলে তা পাক হয়ে যাবে।

মধু, শরবত নাপাক হলে অনুরূপ পানি দিয়ে তিনবার জ্বাল দিলে তা পাক হয়ে যাবে। নাপাক তৈল মাথায় বা শরীরে মালিশ করলে তিনবার ধুয়ে শরীরকে পবিত্র করা যায়।

(ঘ) কুকুরের উচ্ছিষ্ট

কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। কিন্তু যে পাত্রে বা প্লেটে কুকুর মুখ লাগিয়েছে তা তিনবার ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়। তবে শেষ বার মাটি দ্বারা তা ভালোভাবে মাড়িয়ে তারপর ধৌত করার কথা হাদিস শরিফে বলা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে যে, কুকুরের লালাতে যে বিষাক্ত জীবাণু রয়েছে মাটি দ্বারা মাড়িয়ে তারপর পানি দ্বারা ধৌত করলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

ইসতিনজা ও পবিত্রতা অর্জন পদ্ধতি

ইসতিনজা (اِسْتِنْجَاءٌ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ নিষ্কৃতি লাভ করা, নিরাপদ হওয়া, বেঁচে যাওয়া, অপবিত্রতা দূর করা, মলমূত্র ত্যাগ করা।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, পেশাব-পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জনকে اِسْتِنْجَاءٌ বলা হয়। ইসলামি শরিয়তে ইসতিনজার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইসতিনজা থেকে পবিত্রতা অবলম্বনে অবহেলা করা বড় ধরনের কবিরা গুনাহ। যেমন পেশাবের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে না থাকাকে মহানবি (ﷺ) কবরের আযাবের কারণ বলে হাদিসে উল্লেখ করেছেন।

মহানবি (ﷺ) বলেন– اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ

অর্থ : বেশিরভাগ কবর আযাবের কারণ হলো পেশাব। (মুসনাদে আহমদ)।

পেশাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি

ইসতিনজার নিয়ম ও পদ্ধতি নিম্নরূপ–

১। কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা ত্যাগ না করা। কারণ কিবলাকে সম্মান করা ইমানের অঙ্গ। শরিয়তের বিধান মতে ফরয। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرُوْهَا.

অর্থ : তোমরা পেশাব-পায়খানার সময় কিবলাকে সামনে বা পিছনে দিয়ে বসবে না।

২। গর্তে বা শক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানা না করা।

৩। ছায়াদানকারী গাছের নিচে, নদী ও পুকুরের ঘাটে ও ফলবান গাছের নিচে পেশাব-পায়খানা না করা।

৪। জনসাধারণের চলাফেরার রাস্তায়, কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা না করা।

৫। দাঁড়িয়ে পেশাব-পায়খানা না করা।

৬। পেশাব-পায়খানা করার সময় বিনা কারণে কথা না বলা।

৭। টয়লেটে প্রবেশ করার ও বের হওয়ার দোআ পড়া।

৮। মাথায় যে কোনো ধরনের কাপড় দিয়ে টয়লেটে যাওয়া এবং জুতা পায়ে রাখা।

৯। পেশাব-পায়খানা করার সময় সম্পূর্ণ সতর না খুলে প্রয়োজনীয় অংশ খোলা।

১০। টয়লেটে প্রবেশ করার পূর্বে নিম্নোক্ত দোআ পড়ে আগে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ

অর্থ : হে আল্লাহ্ আমি পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তানের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১১। টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হয়ে নিম্নোক্ত দোআ পড়া–

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَ عَافَانِىْ

অর্থ : আমি তোমার ক্ষমা প্রত্যাশী। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন এবং আমাকে শান্তিদান করেছেন।

১২। টয়লেট পেপার/কুলুখ ব্যবহার করা। পেশাব-পায়খানা করার পর প্রয়োজন অনুযায়ী টয়লেট পেপার বা মাটির ঢিলা দিয়ে মলদ্বার ভালো-ভাবে পরিষ্কার করে তারপর পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নত। টয়লেট পেপার বা ঢিলা পাওয়া না গেলে শুধু পানি দিয়েও পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

১৩। হাড়, কয়লা, কাঁচ, লোহা, তামা, পিতল, অথবা এমন কঠিন ধাতু যা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করলে মলদ্বারে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে এমন সব কঠিন বস্তু ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৪। মানুষ ও পশু যে সব বস্তু থেকে উপকার লাভ করে এবং যে সব বস্তুর সম্মান করা জরুরী। সে সব বস্তু ঢিলা, কুলুখ হিসেবে ব্যবহার করা নিষেধ।

১৫। নাপাকি মলদ্বারের বাইরে ছড়িয়ে না পড়লে ঢিলা, কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, আর ছড়িয়ে পড়লে ফরয।

১৬। শৌচকার্য বাম হাত দ্বারা করতে হবে এবং এরপর সাবান বা মাটি দ্বারা উত্তমভাবে হাত ধৌত করতে হবে।

১৭। পবিত্রতার জন্য মাটির ঢিলা ব্যবহার করা ভালো। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে টয়লেট পেপার তবে ব্যবহারের সাথে সাথে পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে সাবান দিয়ে হাত ধূয়ে পরিষ্কার করা উচিত। পেশাবের পর টয়লেট পেপার ব্যবহারের সময় ততটুকু সময় দিতে হবে যেন পরে ফোটা ফোটা পেশাব বের না হয়।

পায়খানা বা প্রস্রাবের পর মাটির চাকা, পাথরের টুকরা বা টয়লেট পেপার ব্যবহারকে ইস্তেজমার বলে। اَلْاِسْتِجْمَارُ অর্থ কুলুখ ব্যবহার করা। কমপক্ষে তিনটি ঢিলা ব্যবহার করতে হবে। পুরুষ শীতকালে প্রথমে সামনের দিক থেকে এরপর পেছনের দিক থেকে তারপর সামনের দিক থেকে ঢিলা ব্যবহার করবে। গ্রীষ্মকালে প্রথমে পেছন দিক থেকে এরপর সামনের দিক থেকে তারপর পেছনের দিক থেকে ঢিলা ব্যবহার করতে হবে। মহিলাদের সবসময় প্রথমে সামনের দিক থেকে এরপর পেছনের দিক থেকে তারপর সামনের দিক থেকে ঢিলা ব্যবহার করতে হবে। পেশাবের পর পুরুষ কুলুখ ব্যবহার করবে। এক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখতে হবে। এমন অবস্থা করা যাবে না যাতে অন্যদের অসুবিধা বা অস্বস্তি ও হাসির কারণ হয়।

তাহারাত অর্জনের পদ্ধতি

তাহারাত অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তা হলো–

১। অজু : যার মাধ্যমে মুখমণ্ডল, হাত, পা মাথাসহ পুরো দেহ পবিত্র হয়ে যায়।

২। তায়াম্মুমঃ অসুস্থ হলে বা পানি পাওয়া না গেলে মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা তায়াম্মুমের নিয়ত করে মুখ ও হাত মাসেহ করার মাধ্যমে পবিত্র করা যায়।

৩। গোসল : গোসলের মাধ্যমে গোটা শরীর পবিত্র করা যায়।

৫। শরীর বা কাপড়ে অপবিত্র কিছু লেগে গেলে পানি ও সাবান বা পাউডার দিয়ে তা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা যায়। তবে সে সাবান ও পাউডার পবিত্র উপাদানে তৈরি হতে হবে।

তাহারাতের আরেক দিক হলো মনের পবিত্রতা। মনের পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন খালেসভাবে অতীতের গুনাহের জন্য তওবা করা। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলসমূহ ঠিকমতো আদায় করা। হারাম ও মাকরুহ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকা। আত্মিক উন্নতির জন্য বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত, দরুদ শরিফ পাঠ ও যিকিরে মশগুল থাকা।

যদি কোনো সাবান ও কাপড় ধোয়ার পাউডারে শুকরের চর্বি থাকে, তবে সেগুলো ব্যবহার না করাই উচিত। কারণ শুকরের চর্বি নাপাক, যা কাপড় ও শরীরকে নাপাক করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোন প্রাণীর চামড়া নাপাক?

ক. উট খ. মহিষ

গ. ছাগল ঘ. শুকর

২। পেশাব-পায়খানার পর ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. নফল

৩। اِسْتِنْجَاءٌ শব্দটির অর্থ কী?

ক. পবিত্র হওয়া খ. ইচ্ছা করা

গ. সংকল্প করা ঘ. গোপন করা

৪। তায়াম্মুম করতে হয়, যিনি–

i. মারাত্মক অসুস্থ

ii. পানি ব্যবহারে অক্ষম

iii. অজুর নিয়ম না জানলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সেলিম সালাত আদায় করে। কিন্তু পেশাব করার পর ঢিলা ব্যবহার করে না।

৫। সেলিমের কাজটি কোন ধরনের গুনাহ?

ক. কবিরা খ. শিরকি

গ. সগিরা ঘ. নেফাকি

২০২৫

৬। এমতাবস্থায় সেলিমের করণীয় হচ্ছে -

i. পেশাবের পর ঢিলা ব্যবহার করা

ii. পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা

iii. এভাবেই পবিত্র হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সাকিনা বেগম একটি পাত্রে এক কেজি ঘি রেখেছিলেন। ঐ পাত্র থেকে কুকুর কিছু ঘি খেয়ে ফেলে। তিনি বাকী ঘি টুকু ফেলে দেন এবং পাত্রটিও ফেলে দেওয়ার মনস্থ করলে তাঁর স্বামী তাকে বললেন, তুমি পাত্রটি পবিত্র করে ব্যবহার করতে পার।

ক. বেশিরভাগ কবরের আযাবের কারণ কী?

খ. দাবাগাত বলতে তুমি কী বোঝ?

গ. সাকিনা বেগমের কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন হয়েছে? আলোচনা কর।

ঘ. সাকিনা বেগমের স্বামীর বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও।

২। আরাফাত ও আজিম দুই বন্ধু। আরাফাত পেশাব-পায়খানার পর মাটির ঢিলা ব্যবহার করে। তা শুনে আজিম বলে এটা আধুনিক যুগে মানায় না। তুমি টয়লেট পেপার ব্যবহার করতে পার।

ক. اَلْاِسْتِنْجَاءُ শব্দের অর্থ কী?

খ. ঢিলা কুলুখ ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

গ. আরাফাতের কাজটি ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আজিমের বক্তব্যটি তুমি কি সমর্থন কর? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২০২৩

দ্বিতীয় পাঠ

তায়াম্মুম

اَلتَّيَمُّمُ

তায়াম্মুমের পরিচয়

তায়াম্মুম (تَيَمُّم) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলা হয়, পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্র হওয়ার নিয়তে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের ফরয

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি। যথা–

১। পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা।

২। উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে তা দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করা ও

৩। উভয় হাত পাক মাটিতে মেরে প্রথমে বাম হাত দ্বারা ডান হাত এবং ডান হাত দ্বারা বাম হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নত

তায়াম্মুমের সুন্নতসমূহ নিম্নরূপ–

১। তায়াম্মুমের শুরুতে তাসমিয়া পড়া।

২। সুন্নত তরিকায় অর্থাৎ তারতিব ঠিক রেখে তায়াম্মুম করা। প্রথমে চেহারা মাসেহ করা এবং তারপর দু হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা।

৩। পবিত্র মাটির উপর হাতের তালুর দিক মারা, পিঠের দিক নয়।

৪। হাত মাটিতে মারার পর ঝেড়ে ফেলা।

৫। মাটিতে হাত মারার সময় আঙ্গুলগুলো প্রসারিত রাখা যাতে ভেতরে ধুলো পৌঁছে যায়।

৬। কমপক্ষে তিন আঙ্গুল দিয়ে চেহারা ও হাত মাসেহ করা।

৭। চেহারা মাসেহ করার পর দাড়ি খিলাল করা।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

১। প্রথমে নিয়ত করে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে তায়াম্মুম শুরু করতে হবে।

২। অতঃপর দু হাত পাক মাটির উপর মারবে। বেশি পরিমাণ ধুলাবালি লাগলে ঝেড়ে নিয়ে অথবা মুখ দিয়ে ফুঁক দিয়ে আলগা ধুলো কমিয়ে নিতে হবে। মুখমণ্ডল মাসেহ করবে, যাতে চুল পরিমাণ স্থানও বাদ না যায়।

৩। পুনরায় পূর্বের ন্যায় মাটির উপর হাতে মেরে এবং হাত ঝেড়ে নিয়ে প্রথমে বাম হাতের তিন আঙ্গুলের মাথার নিম্নভাগ দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠের দিক থেকে শুরু করে কনুইসহ মাসেহ করবে। তারপর বাম হাতের তালুসহ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে কনুই থেকে অঙ্গুলি পর্যন্ত ভিতরের অংশ মাসেহ করবে। এবং আঙ্গুলগুলোর খিলালও করবে। পরে এভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ করবে। তাতে ঘড়ি বা আংটি থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মাসেহ করতে হবে। (আলমগিরি, ১/৩০)

অজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়। তায়াম্মুমের এ অনুমতি মহান আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ।

কখন তায়াম্মুম বৈধ

অজুবিহীন অবস্থায় শরীর নাপাক হলে, হায়েয ও নেফাস শেষে পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে তায়াম্মুম করা জায়েয।

অপারগতার ব্যাখ্যা এই যে, পানি আছে কিন্তু ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা আছে অথবা স্বাস্থ্যের উপর এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যাতে জীবন নাশ হতে পারে। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয। অথবা পানি আছে তার পার্শ্বে শত্রু অথবা হিংস্র প্রাণী থাকে। সফরে পানি সঙ্গে আছে; কিন্তু সামনে কোথাও পানি না পাওয়া যাওয়ার আশংকা থাকতে পারে। অথবা অজু বা গোসল করলে সালাতের সময় চলে যেতে পারে যে সালাতের কাযা নেই। যেমন: ইদের সালাত। পানি কেনার সামর্থ না থাকলে অথবা পানি কিনলে সংকটে পড়ার আশংকা থাকলে। এসব অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

তায়াম্মুম করার পর তা ভঙ্গ হওয়ার কারণ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তা দিয়ে সকল ইবাদত করা যাবে।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ :

১। যে সব কারণে অজু নষ্ট হয় সে সব কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়।

২। অজু ও গোসল উভয়ের জন্য একই তায়াম্মুম করলে যদি অজু নষ্ট হয় তাহলে অজুর তায়াম্মুম নষ্ট হবে কিন্তু গোসলের তায়াম্মুম নষ্ট হবে না। তবে তায়াম্মুমের পরে গোসল ওয়াজিব হয় এমন কোনো কারণ ঘটলে গোসলের তায়াম্মুমও নষ্ট হবে।

৩। পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করা হয়ে থাকলে পানি পাওয়া মাত্র তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়।

৪। রোগের জন্য তায়াম্মুম করা হলে রোগ সেরে যাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়।

৫। পানির নিকটে কোনো হিংস্র জন্তু, সাপ অথবা শত্রু থাকার কারণে তায়াম্মুম করা হয়ে থাকলে যখনই এ আশংকা চলে যাবে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে।

যে সব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ

পবিত্র মাটি, বালু, পাথর, বিলাতি মাটি, চুনাপাথর, হরিতাল, সুরমা, গেরুমাটি প্রভৃতি। এ জাতীয় জিনিস না পেলে তায়াম্মুম জায়েয হবে না। যেমন, সোনা, রূপা, রং, কাঠ, কাপড় এবং শস্য প্রভৃতি। কিন্তু যদি এসব জিনিসের উপর মাটি জমে থাকে তবে মাটির কারণে তাতে তায়াম্মুম জায়েয হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। তায়াম্মুমের ফরজ কয়টি?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

২। নিচের কোনটি তায়াম্মুমের সুন্নত?

ক. নিয়ত করা খ. হাত মাসেহ করা

গ. মুখ মাসেহ করা গ. তাসমিয়া পড়া

৩। তায়াম্মুমের সুন্নত হচ্ছে

i. তারতিব ঠিক রাখা

ii. চেহারা ও হাত মাসেহ করা

iii. চেহারা মাসেহের পরে দাঁড়ি খিলাল করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

আলতাফ সাহেব বৃদ্ধ ও অসুস্থ। অজুতে পানি ব্যবহার করলে অসুখ বেড়ে যায়। তাই তিনি একটি কাঠের টুকরার উপরে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করেন।

৪। আলতাফ সাহেবের তায়াম্মুমের হুকুম কী?

ক. صَحِيْحٌ খ. بَاطِلٌ

গ. فَاسِدٌ ঘ. مَكْرُوْهٌ

৫। আলতাফ সাহেবের উচিত হচ্ছে -

i. শরিয়তের বিধান অনুযায়ী তায়াম্মুম করা

ii. মাটি জাতীয় বস্তু ব্যবহার করা

iii. সুস্থ হলে অজু করে সালাত আদায় করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মামুনের দাদি বৃদ্ধা ও খুবই অসুস্থ। পানি দ্বারা অজু করলে তার অসুখ আরো বেড়ে যায়। তথাপিও তিনি অজু করে সালাত আদায় করেন। একদিন অজু করার পর তার অবস্থা মারাত্মক হয়ে যায়। মামুন দাদিকে বলে দাদি! তুমি তো অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে পার।

ক. تَيَمُّمٌ-এর আভিধানিক অর্থ কী?

খ. তায়াম্মুম করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

গ. মামুনের দাদির কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মামুনের বক্তব্য সঠিক কিনা? দলিলসহ তোমরা মতামত দাও।

তৃতীয় পাঠ
মেসওয়াক
اَلسِّوَاكُ

মেসওয়াকের পরিচয়

মেসওয়াক (مِسْوَاكٌ) শব্দটি سوك ধাতু থেকে নির্গত। হাদিস শরিফে اَلسِّوَاكُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ মাজা, ঘষা, দাঁত মর্দন ও দাঁত পরিষ্কারকরণ। যে বস্তু দিয়ে তা করা হয়, তাকে مِسْوَاكٌ বলা হয়।

পরিভাষায় মেসওয়াক বলা হয়, গাছের ডাল বা শিকড়কে, যা দিয়ে দাঁত মাজা ও পরিষ্কার করা হয়। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ.

অর্থ : মেসওয়াক করলে যেমন মুখ পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়, তেমনি এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। (সহিহ বুখারি ও নাসায়ি)।

প্রিয় রসুল (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

لَوْ لاَ ان اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وَضُوْءٍ.

অর্থ : আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক হবে মনে না করলে আমি প্রত্যেক অজুর সময়ই মেসওয়াক করার জন্য আদেশ করতাম। (সহিহ বুখারি ও সহিহ ইবনি খুজাইমা)

হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِيْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلٰى الصَّلَاةِ الَّتِيْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا.

অর্থ : মেসওয়াক করে যে সালাত আদায় করা হয় সে সালাতে মেসওয়াকবিহীন সালাতের তুলনায় সত্তর গুন বেশি ফযিলত রয়েছে। (বায়হাকি ও মিশকাত)

হজরত আলি (رضي الله عنه) বলেন- মেসওয়াক দ্বারা মস্তিষ্ক সতেজ হয়।

মেসওয়াকের মধ্যে থাকে ফসফরাস জাতীয় পদার্থ। পীলু বৃক্ষের ডালে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অধিক পরিমাণে থাকে। মেসওয়াকের ফলে বিশেষ করে পীলু গাছের মেসওয়াক মুখে স্বাদ ফিরিয়ে আনে, টন্সিল রোগীর জন্য মহৌষধ।

মেসওয়াকের আকৃতি

তিক্ত বৃক্ষের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। এতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, দাঁতের মাড়ি শক্ত হয় এবং হযম শক্তি বৃদ্ধি পায়। যায়তুনের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা উত্তম। পিলু, বাবলা, কানি গাছের মেসওয়াক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। নীম গাছের ডাল দাঁতের জন্য উপকারী হলেও শরীরের শক্তি হ্রাস করে।

মেসওয়াক তাজা, কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ন্যায় মোটা ও এক বিঘত পরিমাণ দীর্ঘ হতে হবে। হাতের আঙ্গুল মেসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হয় না। তবে মেসওয়াক পাওয়া না গেলে ডান হাতের আঙ্গুল বা শক্ত কাপড়ের অংশ মেসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (আলমগিরি)

মেসওয়াক যেন খুব শক্ত কিংবা খুব নরম না হয়ে বরং মাঝামাঝি হওয়া উত্তম। এক বিঘতের চেয়ে কম হওয়া অনুচিত। ব্যবহার করতে করতে ছোট হয়ে গেলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

মেসওয়াক করার পদ্ধতি

মেসওয়াকের মাসনূন তরিকা হলো- ডান হাতে এভাবে ধারণ করতে হবে যেন কনিষ্ট আঙ্গুলি থেকে মেসওয়াকের নিম্ন অংশের নিচে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী মেসওয়াকের উপরের অংশের নিচের দিকে ও অন্যান্য আঙ্গুলগুলো মেসওয়াকের উপরে থাকে। মুখের ডান দিক থেকে শুরু করা এবং দাঁতের প্রস্থের দিক থেকে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব; লম্বালম্বিভাবে নয়। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর, সালাতের অজু করার পূর্বে, মজলিসে যাওয়ার পূর্বে এবং কুরআন ও হাদিস তেলাওয়াত করার পূর্বে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। (মারাকিউল ফালাহ)

অজুর সময় কুলি করার পূর্বে মেসওয়াক করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। অন্যান্য সময় মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। সাওম পালনকারীর জন্য সকাল-সন্ধ্যা যে কোনো সময়ে মেসওয়াক ব্যবহারে কোনো অসুবিধে নেই; তবে ব্রাশ করা অনুচিত।

ব্রাশ ব্যবহার

মেসওয়াক না থাকা অবস্থায় কেউ যদি টুথ ব্রাশ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করে তাতে দাঁত পরিষ্কার হবে, পরিচ্ছন্নতার সওয়াব হবে তবে মেসওয়াকের যে সওয়াব তা পাবে না। যে সব টুথ ব্রাশ শুকরের পশম বা অন্য কোনো নাপাক অথবা হারাম বস্তু দ্বারা তৈরি করা হয় ঐ সব ব্রাশ ব্যবহার করা জায়েয নয়। মেসওয়াক না হলেও ব্রাশ এবং পেস্ট যদি হালাল বস্তু দিয়ে তৈরি হয় তাতে দাঁতের উপকার ও দুর্গন্ধ দূর হওয়াতে মনের প্রশান্তি লাভ হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন শব্দ থেকে مِسْوَاكٌ শব্দটি নির্গত হয়েছে?

ক. اَسْوَاكٌ   খ. سِوَاكٌ

গ. سُوْكٌ   ঘ. سَوِيْكٌ

২। অজুর ক্ষেত্রে মেসওয়াক করার হুকুম কী?

ক. ফরজ   খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত   ঘ. মুস্তাহাব

৩। মেসওয়াক করলে -

i. মস্তিষ্ক সতেজ হয়

ii. মুখ দুর্গন্ধমুক্ত হয়

iii. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. i,ii ও iii

রাশেদ কুরআন তেলাওয়াত করবে। এজন্য সে যয়তুনের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করে অজু করে।

৪। রাশেদের মেসওয়াক করার হুকুম কী?

ক. সুন্নত   খ. মুস্তাহাব

গ. মাকরুহ   ঘ. মুবাহ

৫। এভাবে মেসওয়াক করায় রাশেদের -

i. মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে

ii. দাঁতের মাড়ি শক্ত হবে

iii. হযম শক্তি বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. i,ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মাহবুব তার বন্ধু হাসানের বাড়িতে বেড়াতে আসে। ফজর সালাত পড়ার জন্য উভয়ে ঘুম থেকে উঠে। হাসান অজু করার পূর্বে গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করে। তা দেখে মাহবুব জিজ্ঞেস করল, তোমার কি ব্রাশ নেই? আমি সব সময় ব্রাশ দিয়ে মেসওয়াক করি।

ক. কোন গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা উত্তম।

খ. মেসওয়াক কিভাবে করতে হয় লেখ।

গ. হাসানের কাজটির গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর।

ঘ. 'মাহবুবের ধারণাটি সুন্নতের পরিপন্থি' বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

সালাতের জন্য ইকামত

الإِقَامَةُ لِلصَّلَاةِ

প্রথম পাঠ

ইকামতের পরিচয়

ইকামত (اَلْإِقَامَةُ) শব্দের অর্থ দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠিত করা। শরিয়তের পরিভাষায় জামাআত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আযানের শব্দ বা বাক্যসহ সালাত আরম্ভ হওয়ার কথা ঘোষণা করাকেই 'ইকামত' বলে।

ইকামতের বাক্যসমূহ

ইকামতের বাক্যসমূহ আযানের অনুরূপ। তবে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ অতিরিক্ত দু বার বলতে হয়। নিম্নে ইকামতের বাক্যসমূহ উল্লেখ করা হলো–

ক্রমিক নং	ইকামতের বাক্যসমূহ	বাক্যসমূহের অর্থ	উচ্চারণ করতে হবে
১	اَللّٰهُ أَكْبَرُ	আল্লাহ মহান।	৪বার
২	اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।	২বার
৩	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল।	২বার
৪	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ	এসো সালাতের দিকে।	২বার
৫	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	এসো কল্যাণের দিকে।	২বার
৬	قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ	সালাত কায়েম হয়েছে।	২বার
৭	اَللّٰهُ أَكْبَرُ	আল্লাহ মহান।	২বার
৮	لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।	১বার

ইকামতের মধ্যে এভাবেই ৮টি বাক্য ১৭ বার উচ্চারণ করতে হয়।

দ্বিতীয় পাঠ

ইকামতের সুন্নত তরিকা

ইকামত অর্থ দাঁড় করানো। জামায়াত শুরু হওয়ার আগে আযানের কথাগুলো পুনরায় বলা এবং এ কথা ঘোষণা করা যে, জামায়াত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এ জন্যে ইকামতে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এরপর قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলা হয়, অর্থাৎ সালাত দাঁড়িয়ে গেছে। এর জওয়াবে মুসল্লিগণকে বলতে হয়–

اَقَامَهَا اللهُ وَ اَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَ الْاَرْضُ.

অর্থ : আল্লাহ্ তাআলা সালাত স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, যতদিন এ আকাশ এবং যমিন প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইকামতের জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব। আযান ও ইকামতের মাঝখানে চার রাকাত সালাত আদায় করার পরিমাণ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু মাগরিবের আযানের পর সামান্য দেরি করেই ইকামত বলতে হয়।

ইকামতে সালাতের জন্য দাঁড়াবার সঠিক সময়

ইকামতের জন্য মুয়াজ্জিন প্রথমে দাঁড়াবে। আর মুসল্লিগণ বসে থাকবেন। তিনি যখন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবেন, তখন মুক্তাদিগণ দাঁড়াবেন। (কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া, ১/২২৯)
কিন্তু বহুস্থানে দেখা যায় মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করলেই মুসুল্লিগণ দাঁড়িয়ে যান। কোথাও কোথাও ইকামতের পূর্বেই মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে যান বা তাঁদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। এটা সুন্নতের খেলাফ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ইকামতে اَللّٰهُ اَكْبَرُ কয়বার বলতে হয়?

ক. দুই খ. চার
গ. ছয় ঘ. আট

২। إِقَامَةٌ শব্দের অর্থ কী?

ক. দাঁড় করানো খ. মজবুত করা

গ. প্রস্তুত হওয়া ঘ. শুরু করা

৩। আযান ও ইকামতের মধ্যে অতিরিক্ত বাক্য হচ্ছে -

i. حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

ii. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

iii. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. iii

আসলাম সাহেব ও আফজাল সাহেব দুজনই মসজিদে সালাত আদায় করতে যান। মুয়াজ্জিন ইকামত দিতে গেলে আসলাম সাহেব জবাব দেন। কিন্তু আফজাল সাহেব ইকামতের জবাব দেন না।

৪। আসলাম সাহেবের কাজটির ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়তের বিধান কী?

ক. ওয়াজিব খ. সুন্নত

গ. মুস্তাহাব ঘ. মাকরুহ

৫। আফজাল সাহেবের করণীয় ছিল -

i. ইকামতের জবাব দেওয়া

ii. সালাতের প্রস্তুতি নেওয়া

iii. চুপ করে বসে থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মাওলানা আব্দুর রহমান ঢাকায় এক মসজিদে আসরের সালাত আদায় করতে যান। সেখানে তিনি দেখেন, মুয়াজ্জিন ইকামত দেওয়ার পূর্বেই মুসল্লিগণ সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, মুয়াজ্জিন ইকামতে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ বললে মুসল্লিদের জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব।

ক. ইকামতের মধ্যে কয়টি বাক্য কয়বার বলতে হয়?

খ. اِقَامَةٌ বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুসল্লিগণের কাজটি ইলমে ফিকহের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাওলানা আব্দুর রহমানের বক্তব্যটি ইলমে ফিকহের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়
আস সালাত
اَلـصَّلَاةُ

প্রথম পাঠ
আহকামুস সালাত

সালাতের গুরুত্ব ও উপকারিতা

সালাত (اَلصَّـلَاةُ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দোআ, রহমত, ইসতিগফার ও তাসবিহ ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় সালাত বলতে বোঝায়–

هِيَ عِبَادَةٌ ذَاتُ اَقْوَالٍ وَ اَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيْرِ وَمُخْتَتِمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ.

অর্থ : সালাত এমন কিছু সুনির্ধারিত কথা ও কাজবিশিষ্ট ইবাদত, যা তাকবিরের মাধ্যমে শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয়।

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাত। ফার্সি ভাষায় সালাতকে নামাজ বলে। ইবাদতের মধ্যে সালাতকে عِمَادُ الدِّيْنِ বা দ্বীনের খুঁটি বলা হয়েছে। খুঁটি ছাড়া যেমন ঘর হয় না, তদ্রূপ সালাত ছাড়াও দীন পরিপূর্ণ হয় না। সালাত যে ফরজ তা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। বালিগ পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই তা অবশ্য পালনীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَ أٰتُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.

অর্থ : তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।
(সুরা বাকারা, ৪৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا.

অর্থ : নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনের জন্য অবশ্যকর্তব্য। (সুরা নিসা, ১০৩)

মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ صَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَحَجُّوْا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُسَكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

অর্থ : তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রমযানে সাওম পালন করো, বায়তুল্লাহ শরিফের হজ আদায় করো, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের সম্পদের যাকাত আদায় করো; তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে দাখিল হতে সক্ষম হবে।

(বাদায়েউস সানায়ে, ১/৮৯)

মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَرَأَيْتُمْ لَوْ اِنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِه شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِه شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْا اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا .

অর্থ : তোমাদের কি মত! যদি কারো ঘরের দরজায় কোনো নদী থাকে এবং তাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে নিয়মিত গোসল করে তবে এ গোসলসমূহ তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে দিবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন- 'না তার দেহে কোনো ময়লাই থাকতে দেবে না'। তখন নবি করিম (ﷺ) বললেন- 'পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্তও ঠিক তদ্রূপ। আল্লাহ এ সকল সালাতের মাধ্যমে যাবতীয় গুনাহ খাতা দূর করে দেবেন'। (সহিহ বুখারি)

সালাতের ওয়াজিবসমূহ

সালাতের ওয়াজিব বলতে ঐ সব করণীয় বিষয় বোঝায়, যার কোনো একটিও ভুলক্রমে বাদ গেলে 'সাজদায়ে সাহু' আদায় করতে হয়।

সালাতের ওয়াজিব অনেক, এর মধ্যে অন্যতম হলো ১৪ টি। যথা–

১। ফরজ সালাতের প্রথম দুই রাকাতে এবং বেতের, সুন্নত ও নফল সালাতের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করা।

২। সুরা ফাতেহার সাথে সুরা মিলানো।

৩। রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৪। দুই সাজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৫। তিন ও চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতে দুই রাকাতের পর বসা।

৬। প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

৭। ইমামের জন্য কিরাআত ওয়াক্ত অনুযায়ী আস্তে এবং জোরে পড়া।

৮। বেতেরের সালাতে দোআয়ে কুনুত পড়া।

৯। দুই ইদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।

১০। ফরয সালাতে প্রথম দুই রাকাতকে কেরাতের জন্য নির্ধারিত করা।

১১। প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলোর তারতিব ঠিক রাখা।

১২। প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলোর তারতিব ঠিক রাখা।

১৩। 'তাদিলে আরকান' অর্থাৎ রুকু, সাজদা, দাঁড়ানো, বসায় কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ স্থির থাকা।

১৪। সালাম বলে সালাত শেষ করা।

সালাতের সুন্নতসমূহ

সালাতের সুন্নতে মুয়াক্কাদা ১৬টি। যথা–

১। তাকবিরে তাহরিমা বলার পূর্বে পুরুষের কানের লতি এবং মহিলার কাঁধ পর্যন্ত দুহাত উঠানো।

২। তাকবিরে তাহরিমা বলেই পুরুষের নাভির নিচে এবং মহিলার বুকের উপর হাত বাঁধা।

৩। তাকবিরে তাহরিমার সময় মস্তক অবনত না করা।

৪। ইমামের জন্য তাকবির উচ্চস্বরে বলা।

৫। সানা পড়া।

৬। প্রথম রাকাতে সানার পর أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পড়া।

৭। প্রত্যক রাকাতে সুরা ফাতেহার পূর্বে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়া।

৮। সুরা ফাতেহার শেষে আমিন বলা।

৯। ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধুমাত্র সুরা ফাতেহা পড়া।

১০। সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও আমিন আস্তে পড়া।

১১। প্রত্যেক উঠা বসায় اَللهُ أَكْبَرُ বলা।

১২। রুকুর তাসবিহ পড়া ।

১৩। রুকু থেকে উঠার সময় سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ পড়া।

১৪। সাজদার তাসবিহ পড়া।

১৫। দরুদ শরিফ পড়া।

১৬। দোআয়ে মাসুরা পড়া।

সালাতে যে সব কাজ মাকরুহ

১। সালাতে এদিক-সেদিক তাকানো।

২। সালাতে আকাশের দিকে তাকানো।

৩। পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে সালাত আদায় করা।

৪। খাওয়া সামনে নিয়ে সালাত আদায় করা।

৫। সাজদায় দুই হাতের কনুই বিছিয়ে দেওয়া।

৬। এমন কিছুর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা, যার দ্বারা মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে।

৭। কাপড়, রুমাল ইত্যাদি গলায় ঝুলিয়ে সালাত আদায় করা।

৮। ঘুমের চাপ নিয়ে সালাত আদায় করা।

৯। সালাতের জন্য বিশেষ স্থান নির্ধারণ।

১০। কোনো সুরাকে বিশেষভাবে কোনো সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা।

১১। সালাতের মধ্যে আঙ্গুল মটকানো অথবা এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মাঝে প্রবেশ করানো।

সালাতে দাঁড়ানোর নিয়ম

সালাতে দাঁড়ানো ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

অর্থ : তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। (সুরা বাকারা, ২৩৮)

কেউ যদি দাঁড়াতে অক্ষম হয় তবে সে বসে বসে সালাত আদায় করবে। যদি বসতেও অক্ষম হয় তাহলে শুয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে।

সালাতে কিবলামুখী হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। দুই পায়ের পাতা সমানভাবে রাখতে হবে। পুরুষগণ দুই পায়ের মাঝে কমপক্ষে দুই ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁক রেখে দাঁড়াবে। মহিলাগণ দু পায়ের পাতা মিলিয়ে দাঁড়াবে।

রুকু থেকেও পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। অর্ধেক দাঁড়িয়ে ঝুঁকে আবার সেজদায় চলে গেলে ওয়াজিব তরক হবে।

বসে সালাত আদায় করার বিধান

ফরয, ওয়াজিব, ফযরের সুন্নত ও দুই ইদের সালাতে দাঁড়ানো ফরয। তবে শারীরিক অসুস্থতা বা দাঁড়ানোর সুযোগ না থাকলে বসে সালাত আদায় করতে হয়। চেয়ারে বসে সালাত আদায় করতে হলে রুকুতে একটু ঝুঁকে তাসবিহ পড়তে হবে, সেজদাতে আরও একটু অধিক ঝুঁকে সেজদার তাসবিহ পড়তে হবে। সমান স্থানে বসে সালাত আদায় করলে সামনে শক্ত কিছু রেখে তাতে সেজদা করা যাবে। যদি শক্ত কিছু পাওয়া না যায় তবে যমিনে সেজদা দেওয়া সম্ভব হলে সেজদা দিতে হবে আর সম্ভব না হলে রুকুতে যতটুকু ঝুঁকবে সেজদায় আরো অধিক ঝুঁকে সেজদার তাসবিহ আদায় করবে।

শারীরিক দুর্বলতার কারণে যদি এক রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করার পর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না হয় তাহলে বাকি সালাত বসে আদায় করা যাবে। বসে সালাত আদায় শুরু করে শরীরে শক্তি অনুভব করলে বাকি সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করতে হবে।

রুকু সেজদার নিয়ম ও দোআ

(ক) রুকু : স্ত্রীলোকের রুকু করার নিয়ম এই যে, বাম পায়ের টাখনু ডান পায়ের টাখনুর সাথে মিলিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দুই হাতের আঙুলগুলো যুক্ত অবস্থায় দুই হাঁটুর উপর স্থাপন করবে এবং হাতের বাজুও কনুই শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

আর পুরুষ দুই পা স্বাভাবিকভাবে খাড়া রাখবে। মাথা, পিঠ এবং নিতম্ব বরাবর রাখবে। দুই হাতের আঙুলি দ্বারা দুই হাঁটু শক্ত করে ধরবে। হাতের বাজু ও কনুই শরীর থেকে পৃথক রাখবে। রুকুতে তাসবিহ তিনবার পড়া মুস্তাহাব। রুকুর তাসবিহ নিম্নরূপ−

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

রুকুর চিত্র

(খ) সেজদা : রুকু থেকে দাঁড়ানোর পর সোজা সেজদায় যেতে হবে। প্রথমতঃ হাঁটু তারপর হাতের পাতা রেখে দুই পাতার মাঝখানে মাথা নাক ও কপাল মাটিতে রাখবে এবং দুই পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী করে মাটিতে রাখবে। পুরুষ উভয়পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। মাথা হাটু হতে দূরে, হাতের কব্জি মাটি হতে উপরে এবং পায়ের নলা উরু হতে বিচ্ছিন্ন রাখবে। মহিলাগণ পায়ের পাতা খাড়া না রেখে উভয় পাতা ডান দিকে যমিনে শোয়াবে, যথাসম্ভব কিবলামুখী করে হাত, পা ও পেট তথা সর্বাঙ্গ মিলিত করে রাখবে। সেজদাতে তাসবিহ তিন বার পড়া মুস্তাহাব। সেজদার তাসবিহ নিম্নরূপ – سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

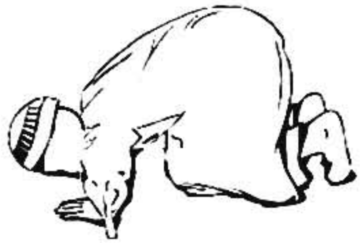

সালাতে বসার নিয়ম

সালাতে পুরুষগণ বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে আঙ্গুলগুলোর মাথা কিবলামুখী করে রাখবে। আর মহিলাগণ উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বিছিয়ে নিতম্ব যমিনে লাগিয়ে বসবে এবং দুই হাতের পাতা উরুর উপর বিছিয়ে রাখবে।

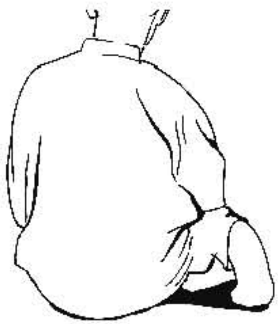

সালাম ফিরানোর বিধান

সালাত শেষে আসসালামু আলাইকুম বলে সালাত শেষ করা ওয়াজিব। সালাম ফিরানোর সময় ইমাম সাহেবকে সকল মুসল্লির দিকে খেয়াল করতে হবে। যদি কেউ সালাত শেষে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ' না বলে দুনিয়ার কোনো কথা বলে বা এমনি উঠে চলে যায়, তবে তার ওয়াজিব তরক হবে। ফরয আদায় হয়ে যাবে কিন্তু ওয়াজিব পালন না করায় ঐ সালাত আবার আদায় করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সালাত ইসলামের কততম স্তম্ভ?

ক. দ্বিতীয় খ. তৃতীয়

গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম

২। নিচের কোনটি সালাতের ওয়াজিব?

ক. কিরাআত পড়া খ. রুকু করা

গ. তাশাহুদ পড়া ঘ. কিয়াম করা

৩। সালাতের সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কয়টি?

ক. ১০ খ. ১২

গ. ১৪ ঘ. ১৬

৪। নিয়মিত সালাত আদায়ের মাধ্যমে–

i. গুনাহ-খাতা দূর হয়

ii. জান্নাত লাভের পথ সুগম হয়

iii. আল্লাহর হুকুম পালন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

মাহির যোহরের সালাত পড়তে গিয়ে দুই রাকাত আদায়ের পর বৈঠক না করেই দাঁড়িয়ে গেল। স্মরণ হওয়ার পরেও অবশিষ্ট সালাত শেষ করল।

৫। মাহির সালাতের কোন বিধান লংঘন করল?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২০২৫

৬। প্রথম বৈঠকের ভুল স্মরণ হওয়ার পর মাহিরের করণীয় ছিল -

i. স্মরণ হওয়া মাত্রই প্রথম বৈঠক করা

ii. সালাত ছেড়ে পুনরায় সালাত পড়া

iii. সাজদায়ে সাহু দিয়ে সালাত শেষ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তানভীর দাখিল সপ্তম শ্রেণির একজন ছাত্র। তাদের ঘর তৈরি করতে যেয়ে তার পিতা বললেন, খুঁটি ছাড়া যেমন ঘর তৈরি হয় না; তদ্রূপ সালাত ছাড়া দীন পরিপূর্ণ হয় না। এ কথা শুনে তার মা বলে উঠলেন, সালাত আদায় না করলে তো মুমিন হিসেবে পরিচয় দেওয়া যায় না।

ক. اَلصَّلٰوةُ-এর আভিধানিক অর্থ কী?

খ. সালাতের মধ্যে قِيَامٌ এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. তানভীরের পিতার বক্তব্য ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মায়ের উক্তিটির যথার্থতা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিরূপণ কর।

২। আতিক সাহেব অসুস্থতার কারণে বসে ইশারায় আসরের সালাত আদায় করছেন। এ মুহূর্তে আরমান সাহেব এসে দেখলেন- তিনি বসে সালাত আদায় করছেন। সালাত শেষে তিনি আতিক সাহেবকে বললেন, সালাতের মধ্যে কিয়াম করা ফরয। আর ফরয আদায় ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। সুতরাং, আপনার সালাত সঠিক হয় নাই।

ক. সাজদার মধ্যে পঠিত তাসবিহটি লেখ।

খ. সালাতে সালাম ফিরানোর বিধান বর্ণনা কর।

গ. আরমান সাহেবের বক্তব্যটি ইসলামি শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আতিক সাহেবের কাজটির যথার্থতা ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় পাঠ
সালাতের কিরাত
اَلْقِـرَأَةُ فِـى الصَّلَاةِ

কিরাতের পরিচয় ও হুকুম

কিরাত (اَلْقِرَأَةُ) অর্থ পাঠ করা। ব্যবহারিক অর্থে সালাতে পবিত্র কুরআন পাঠ করাকে কিরাত বলা হয়। সুতরাং اَلْقِرَأَةُ فِى الصَّلَاةِ–এর অর্থ হলো, সালাতে কুরআন মাজিদ পাঠ করা।

কুরআন মাজিদের সুরাগুলো যে তারতিব বা ক্রমানুসারে লেখা আছে, সালাতের মধ্যে উক্ত তারতিব অনুসারেই পাঠ করতে হবে। জেনে-বুঝে পরের সুরা আগে এবং আগের সুরা পরে পাঠ করা ঠিক নয়। সালাতের মধ্যে সবসময় একই সুরা নির্দিষ্ট করে পড়া মাকরুহ। বিনা ওযরে একই সুরার কয়েক জায়গা থেকে কয়েক আয়াত পড়া মাকরুহ।

সালাত যেমন ফরয, সালাতে কিরাত পড়াও ফরয। তাই কিরাত বিশুদ্ধভাবে পড়তে জানাও ফরয। তেলাওয়াত সহিহ শুদ্ধ না হলে সালাত শুদ্ধ হবে না।

যে সকল ভুলের কারণে অর্থের বিকৃতি ঘটে, এ ধরনের ভুলকে لَحْنٌ جَلِيٌّ (প্রকাশ্য বা বড় ভুল) বলে। সালাতের যে কোনো পর্যায়ে لَحْنٌ جَلِيٌّ হয়ে গেলে, সালাত বাতিল হয়ে যায়।

অশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতকারী সম্পর্কে রসুল (ﷺ) বলেন–

رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُه

অর্থ : অনেক কুরআন তেলাওয়াতকারী রয়েছে, যারা কুরআন তেলাওয়াত করে, আর কুরআন তাদেরকে লানত করে।

কিরাআতের পরিমাণ

সালাতের মধ্যে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ পাঠ করা ওয়াজিব। জামাআতে সালাত আদায়কালে ইমামের পিছনে মুক্তাদির কিরাআত পাঠ করা ফরয নয় বরং কিরাত পড়া নিষেধ। কেননা রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

قِرَأَةُ الْإِمَامِ قِرَاةٌ لَّـهُ

অর্থ : ইমামের কিরাতই মুক্তাদির কিরাআত।

তৃতীয় পাঠ
কাযা সালাত
صَلَاةُ الْقَضَاءِ

কাযা সালাতের পরিচয়

কাযা (قَضَاءٌ) শব্দের অর্থ পূর্ণ করা। পরিভাষায় ফরয বা ওয়াজিব সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা না হলে সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আদায় করাকে কাযা সালাত বলা হয়। কাযা সালাত আদায় করার অনুমতি শরিয়ত দিলেও ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত কাযা করা কবিরা গুনাহ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

অর্থ : যে লোক কোনো সালাত ভুলে যাবে সে যেন পড়ে নেয় যখনই তা স্মরণ হয়। সে জন্য কোনো কাফফারা দিতে হবে না, শুধু তাই পড়তে হবে। কুরআন মাজিদে ইরশাদ করা হয়েছে সালাত কায়েম কর আমার স্মরণের জন্য। (সহিহ বুখারি)

অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে–

اَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا فَاِنَّ كَفَّارَتُهَا اَنْ يُّصَلِّيْهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

অর্থ : কিংবা যদি সালাত সম্পর্কে বেখেয়াল হয়ে যায়, তাহলে তার কাফফারা হলো যখনই স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নিতে হবে। (সুনানু নাসায়ি)

কাযা সালাতের পদ্ধতি

ফরয সালাতের কাযা ফরয এবং ওয়াজিব সালাত যেমন- বেতেরের কাযা ওয়াজিব। মান্নত করা সালাতের কাযাও ওয়াজিব। নফল সালাত আরম্ভ করার পর তা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোনো কারণ বশতঃ নফল সালাত নষ্ট হয়ে গেলে বা কোনো কারণ বশতঃ শুরু করার পর ছেড়ে দিলে তার কাযা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

যদি কারো কয়েক ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়ে থাকে, তবে যথাশীঘ্র সব সালাত এক ওয়াক্তেই কাযা আদায় করতে পারলে তা উত্তম। যে ওয়াক্তের সালাত তা সে ওয়াক্তেই কাযা করতে হবে, তেমন

জরুরি নয়। কাযা সালাত পড়ার কোনো সময় নির্ধারিত নেই। তবে মাকরুহ ও হারাম ওয়াক্তে আদায় করা যাবে না।

কয়েকজনের একই সাথে সালাত কাযা হয়ে গেলে, সম্ভব হলে তাদের জামাতের সাথে কাযা আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

সফরকালীন সময়ের কাযা সালাত মুকিম অবস্থায় আদায় করলে কসর আদায় করতে হবে। অনুরূপ মুকিম অবস্থায় কাযা সালাত সফরে পড়লে পূর্ণই পড়তে হবে।

কারো পাঁচ ওয়াক্তের বেশি সালাত কাযা হলে তার ক্রমানুসারে কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে ছয় ওয়াক্তের কম কাযা হলে, তারতিব রক্ষা করে ক্রমানুসারে তা কাযা করা জরুরি।

(শামী ১/৫৩৪)

যখন সালাত কাযা করা বৈধ

১। **শত্রুর ভয় :** মুসাফির যদি চোর ডাকাতের ভয় করে এবং সালাত আদায় অবস্থায় নিজ মাল ও আসবাব পত্রের হিফাযত করা তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে সে সালাত কাযা করতে পারে।

২। **সন্তান প্রসবকালে :** ধাত্রীর জন্য সালাত বিলম্বিত করার অনুমতি রয়েছে। যদি সালাত আদায়ের ফলে তার অনুপস্থিতিতে সন্তানের মৃত্যু বা তার কোনো অঙ্গহানির বা সন্তানের মা মারা যাওয়ার অথবা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তাহলে ধাত্রী তখন সালাত আদায় না করে পরবর্তী সময়ে কাযা আদায় করবে।

৩। **ঘুমিয়ে থাকা :** কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে এবং ওয়াক্ত চলে যাবার পর তার ঘুম ভাঙ্গে, তার এই সালাত কাযা আদায় করা ফরয।

৪। **সালাতের কথা ভুলে যাওয়া :** কেউ যদি সালাতের কথা একেবারে ভুলে যায় এবং পরে মনে পড়ে তাহলে তার এ সালাতও কাযা আদায় করা ফরজ।

কাযা সালাতের নিয়ত

নমুনা স্বরূপ ফজরের দুই রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَــىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ الْفَائِتَةِ فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি ফজর সালাতের ফরযের কাযা সালাত কিবলামুখী হয়ে আদায় করছি, আল্লাহু আকবার।

কোনো সালাতেই নিয়ত আরবিতে করতে হবে এমনটা জরুরি নয়। তবে আরবি যদি বিশুদ্ধভাবে করা যায় তা উত্তম। যারা আরবিতে নিয়ত করবেন তারা ফজর শব্দের স্থলে যে যেই ওয়াক্তের সালাতের কাযা আদায় করবেন সেই ওয়াক্তের সালাতের নাম বলবেন।

মৃত ব্যক্তির কাযা সালাতের কাফ্ফারা

যদি কোনো ব্যক্তি কাফফারা আদায় করার জন্য ওসিয়ত না করেই মৃত্যুবরণ করে অথবা কাফফারা আদায় করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে না যায়, তাহলে মৃতব্যক্তির পক্ষে কাফফারা আদায় করা উত্তরাধিকারীদের উপর ওয়াজিব নয়। তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে কাফফারা আদায় করে দেয় তাহলে তা জায়েয।

মৃতব্যক্তির কাযা সালাত ও সাওমের কাফফারা সালাত বা সাওম দিয়ে আদায় করা যায় না। প্রতি ফরয ও ওয়াজিব সালাতের পরিবর্তে সদকায়ে ফেতর বা ফেতরার সমপরিমাণ গম বা তার মূল্য ফিদয়া স্বরূপ দিতে হয়। অতএব যদি কারো একদিনের সালাত কাযা হয়ে থাকে এবং তা আদায় করার পূর্বেই সে মারা যায় এবং মৃত্যুর সময় ফিদয়া দেওয়ার জন্য ওসিয়ত করে যায়, তবে তার জন্য বেতেরের সালাতসহ প্রতি সালাতের পরিবর্তে একটা সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সালাতে কেরাত পড়ার বিধান কী?

ক. ফরজ   খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত   ঘ. মুস্তাহাব

২। কোন সালাতের কাযা পড়তে হয় না?

ক. ফরজের   খ. বেতেরের

গ. মানতের   ঘ. নফলের

৩। قَضَاءٌ শব্দের অর্থ কী?

ক. ফয়সালা করা খ. নির্ধারিত করা

গ. পূর্ণ করা ঘ. বারবার করা

৪। সালাত কাযা করা জায়েয, যদি -

i. মুসাফির শত্রুর ভয় করে

ii. মানুষ অসুস্থ হয়

iii. ধাত্রী কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

আজাদ সাহেব প্রতিদিন মাগরিব সালাতে সুরা লাহাব ও ইখলাস নির্দিষ্ট করে তেলাওয়াত করেন।

৫। আজাদ সাহেবের তেলাওয়াত সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কী?

ক. হালাল খ. হারাম

গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

৬। আজাদ সাহেবের করণীয় হচ্ছে

i. অনির্দিষ্ট সুরা তেলাওয়াত করা

ii. সহিহ শুদ্ধ তেলাওয়াত করা

iii. এভাবেই সালাত চালিয়ে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

শফিক ও রফিক দুজন বাজারে যায়। শফিক বাজারে গিয়ে বেখেয়ালে আসরের সালাত পড়তে পারেনা। এদিকে সময়ও চলে যায়। আর রফিক পরে পড়বে ভাবতে ভাবতে সালাতের সময় চলে যায়। উভয়েরই আসরের সালাত কাযা হয়ে যায়।

ক. কোন সালাতের সুন্নতের কাযা করতে হয়?

খ. 'শত্রুর ভয়ে সালাত কাযা করা যায়' ব্যাখ্যা কর।

গ. শফিকের করণীয় কী? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর।

ঘ. রফিকের মতো এভাবে সালাত তরককারীর পরিণতি কী? বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ পাঠ

সালাতুল বেতের

صَلَاةُ الْـوِتْـرِ

সালাতুল বেতেরের পরিচয়

বেতের (وِتْرٌ) শব্দের অর্থ বেজোড়, একক, সঙ্গীবিহীন। সালাতুল বেতেরকে এজন্য বেতের বলা হয় যে, এই সালাতের রাকাত সংখ্যা বেজোড়। ইশার সালাতের পর যে বেজোড় সালাত আদায় করা হয়, তাকে বেতের সালাত বলে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : বেতের সালাত সত্য, যে লোক বেতেরের সালাত আদায় করবে না, সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য নয়। (আবু দাউদ)

তিনি আরো ইরশাদ করেন–

اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

অর্থ : তোমরা বেতেরের সালাত আদায় করো, কেননা আল্লাহ তাআলা বেতের তথা বেজোড় (একক) এবং তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।

বেতেরের সালাত আদায় করা ওয়াজিব। বেতেরের সালাত ছেড়ে দিলে গুনাগার হবে। কোনো কারণবশত বেতেরের সালাত ছুটে গেলে এর কাযা আদায় করতে হবে। রমযান মাসে তারাবিহ সালাত আদায়ের পর জামাআতবদ্ধভাবে বেতেরের সালাত আদায় করা যায়।

বেতেরের সালাতের নিয়ত নিম্নরূপ–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلَاثَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

বেতেরের রাকাত সংখ্যা

বেতেরের সালাত তিন রাকাত। অধিকাংশ সাহাবি ফকিহ তিন রাকাত পড়তেন। হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ

অর্থ : নবি করিম (ﷺ) তিন রাকাত বেতের সালাত আদায় করতেন এবং একেবারে শেষ রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতেন। (মুস্তাদরাকে হাকিম)

বেতের আদায়ের উত্তম সময় ও বৈধ সময়

হজরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবি (ﷺ) বলেছেন, যার শেষরাতে জাগ্রত না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সে যেন প্রথম রাতেই বেতের সালাত আদায় করে নেয়। আর যার শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার অভ্যাস আছে, সে যেন শেষ রাতেই বেতের আদায় করে। কেননা শেষ রাতের সালাতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকেন। আর এটাই হলো উত্তম। (সহিহ মুসলিম)

দোআ কুনুত

বেতের সালাতে দোআ কুনুত পড়া ওয়াজিব। এ কুনুত তিন রাকাত বেতের সালাতের শেষ রাকাতে কিরাত পড়ার পর তাকবির বলে রুকুতে যাওয়ার আগেই পড়তে হয়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ) রুকু করার পূর্বে দোআ কুনুত পড়তেন। (দারে কুতনি)

হজরত আলি (রা.) বলেন–

قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اٰخِرِ الْوِتْرِ.

অর্থ : রসুলে করিম (ﷺ) বেতের সালাতের শেষ রাকাতে দোআ কুনুত পাঠ করেছেন।

দোআ কুনুত নিম্নরূপ–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ. اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনারই সাহায্য প্রার্থী এবং একমাত্র আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থী। আপনার উপর আমরা ইমান এনেছি এবং আপনার উপরই ভরসা রাখি। আমরা আপনার উত্তম প্রশংসা করি, আপনার শুকরিয়া আদায় করি। যারা আপনার নাফরমানী করে তাদেরকে পরিত্যাগ করছি এবং তাদের সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করছি। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্যই সালাত আদায় করি এবং আপনার উদ্দেশ্যেই সাজদা করি, আপনার দিকেই দ্রুত ধাবিত হই, আপনার হুকুম পালনের জন্যই প্রস্তুত থাকি, আপনার দয়ার আশা করি, আপনার শাস্তিকে ভয় পাই। নিঃসন্দেহে আপনার শাস্তিভোগ করবে কাফির সম্প্রদায়।

কারো দোআ কুনুত মুখস্থ না থাকলে, মুখস্থ করে নিতে হবে। দোআয়ে কুনুত মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত দোআ পড়লে চলবে–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং পরকালেও কল্যাণ দিন আর জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। (সুরা বাকারা, ২০১)

এ দোআও জানা না থাকলে তিনবার পড়তে হবে– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন।

অথবা তিনবার পড়তে হবে يَا رَبِّ (অর্থ : হে প্রভু!)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বেতেরের সালাত কয় রাকাত?

ক. এক খ. তিন

গ. পাঁচ ঘ. সাত

২। বেতেরের সালাতে দোআ কুনুত পড়ার হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৩। বেতেরের সালাত আদায় করতে হয়, কারণ ইহা -

i. আদায় করা ওয়াজিব

ii. অত্যধিক ফযিলতপূর্ণ

iii. আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

রাসেল বলে, আল্লাহ্ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন।বেতের হচ্ছে অতিরিক্ত তাই এ সালাত পড়ে না।

৪। রাসেল শরিয়তের কোন বিধান লংঘন করছে?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৫। রাসেলের করণীয় হচ্ছে -

i. বেতেরের সালাত আদায় করা

ii. আল্লাহর কাছে তওবা করা

iii. উপরোক্ত বক্তব্য বর্জন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

তানিমের দাদা ইশার সালাতের পর সালাত আদায় করতে যেয়ে এক রাকাত আদায় করেন এবং রুকুর পরে দোআ কুনুত পাঠ করেন। তানিম তা দেখে বলল, দাদা আপনি কি সালাত পড়লেন? বেতের সালাত তো তিন রাকাত এবং তৃতীয় রাকাতে রুকুর পূর্বে দোআ কুনুত পড়তে হয়। দাদা তানিমকে লক্ষ্য করে বললেন, হাদিসে বেতেরের সালাত এক রাকাত এর কথাও বর্ণিত আছে।

ক. وِتْرٌ শব্দের অর্থ কী?

খ. সালাতুল বেতের বলতে কী বোঝ?

গ. তানিমের দাদার সালাতকে শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তানিমের বক্তব্যকে ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম পাঠ

জানাজা সালাত

صَلَاةُ الْـجَنَازَةِ

জানাজা সালাতের পরিচয়

জানাজা (اَلْجَنَازَةُ) শব্দের অর্থ হলো লাশ। صَلَاةُ الْجَنَازَةِ বা জানাজার সালাত অর্থ হলো মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ প্রকারের সালাত। জানাজার সালাত ফরজে কেফায়া (فَرْضُ كِفَايَةٍ)। কিছু সংখ্যক লোক এ সালাত আদায় করলেই সকলের ফরজ আদায় হয়ে যায়। কেউ আদায় না করলে সকলে গুনাহগার হয়।

জানাজা সালাতে ফরয দুইটি। যথা–

(১) তাকবির বা আল্লাহু আকবার চার বার বলা ও

(২) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা।

এই সালাতে রুকু ও সেজদা নেই। ওজর ব্যতীত জানাজার সালাত বসে পড়া জায়েয নয়। কোনো কিছুর উপর উঠে সালাত আদায় করাও জায়েয নয়।

জানাজার ওয়াজিব একটি : চতুর্থ তাকবির বলার পর সালাম ফিরানো।

জানাজা সালাতে সুন্নত তিনটি। যথা–

(১) আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা পড়া।

(২) নবি করিম (ﷺ)-এর উপর দরুদ শরিফ পড়া।

(৩) মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ করা।

মৃত ব্যক্তি যেহেতু আমল করতে পারে না তাই তার জন্য যত বেশি পারা যায় দোআ করা প্রয়োজন। জানাযা সালাতের আগে ও জানাজার পরে, কবরে রেখে যত বেশি তার জন্য দোআ করা যাবে ততই মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে। জানাজা সালাতের পর দোআ করার ক্ষেত্রে হাদিসে ও শরিয়তে নিষেধ করা হয়নি।

জানাজার সালাতে তাকবির সংখ্যা

জানাজার সালাতে তাকবির সংখ্যা চারটি। প্রত্যেকটি তাকবির এক রাকয়াত সালাতের স্থলাভিষিক্ত। এ সালাতে রুকু সাজদা নেই। প্রথম তাকবিরের পর সানা পাঠ করবে। দ্বিতীয় তাকবিরের পর দরুদ পাঠ করবে। তৃতীয় তাকবিরের পর দোআ পাঠ করবে। চতুর্থ তাকবিরের পর সালাম ফিরাবে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন :

صَلُّوْا عَلٰى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ أَوِالنَّهَارِ وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَ الدَّنِيِّ وَ الْاَمِيْرِ اَرْبَعًا.

অর্থ : তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর জানাজার সালাত আদায় কর, রাতে কিংবা দিনে, সে ছোট হোক বা বড়, ধনী হোক বা গরীব, চার তাকবির সহকারে। (মু'জামুল আওসাত)

হজরত জাবির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত–

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِـيَّ ﷺ صَلَّ عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

নবি করিম (ﷺ) নাজ্জাশি বাদশাহ আসহামা এর জানাজার সালাত চার তাকবিরের সাথে আদায় করেছেন। (সহিহ বুখারি)

দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর ধরে মক্কা মুকাররমা ও মদিনা তয়্যিবায় চার তাকবিরে জানাজা সালাত আদায় হয়ে আসছে।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি

একটি চওড়া তক্তা বা খাটের চতুর্দিকে ৩/৫/৭ বার লুবান অথবা আগরবাতি দিয়ে ধোঁয়া দিতে হবে। তারপর তক্তার উপরে রেখে পরিধানের সমস্ত কাপড় চোপড় ইত্যাদি খুলে ফেলতে হবে শুধু নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবে। যদি গোসলের পানি অন্য দিকে গড়িয়ে যাওয়ার রাস্তা না থাকে, তবে খাটের নিচে একটি গর্ত করতে হবে যেন পানি সেখানে জমা হয়।

গোসল দানকারীর হাতে নেকড়া পেঁচিয়ে প্রথমে ঢিলা দ্বারা পরে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করাতে হবে। সাবধান লজ্জাস্থান খালি হাতে স্পর্শ, অথবা দর্শন করবে না। তারপর অজুর অঙ্গগুলো অজুর নিয়মানুযায়ী ধোয়াবে। কিন্তু কুলি করানো বা নাকে পানি দেওয়া বা কব্জি পর্যন্ত ধৌত করার প্রয়োজন নেই। গোসলের পূর্বে নাক, মুখ, কানের ছিদ্র ও দাঁতের গোড়া তিনবার মুছে দিতে হবে।

যদি মৃত ব্যক্তি গোসল ফরজ অবস্থায় মারা যায়, তবে এভাবে মুছে দেওয়া ওয়াজিব। মাথার চুল এবং দাঁড়ি সাবান ইত্যাদি দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিবে। তারপর মুর্দাকে বাম কাতে শোয়ায়ে শরীরের উপর মাথা হতে পা পর্যন্ত বরই পাতাসহ সহ্যমত গরম পানি দ্বারা ৩/৫ বার পানি ঢেলে পরিষ্কার করে ধৌত করতে হবে। তারপর আবার ডান কাতে শোয়ায়ে বাম পার্শ্বেও এরূপে ৩/৫ বার পানি ঢেলে ধুতে হবে।

এরূপে গোসল হয়ে গেলে, গোসল দানকারী মুর্দাকে নিজ শরীরের সহিত টেক লাগিয়ে কিঞ্চিত উঁচু করে বসাবে এবং আস্তে আস্তে তার পেটের উপর মালিশ করবে। তাতে পেট হতে যদি কিছু ময়লা বের হয়, তবে কুলুখ করিয়ে শুধু ময়লাটুকু ধুয়ে দিবে। অজু-গোসল দোহরাতে হবে না। যদি সম্ভব ও সহজ হয়, তবে মুর্দাকে বাম কাতে শোয়াবে এবং কর্পূরের পানি মুর্দারের মাথা হতে পা পর্যন্ত তিনবার ঢালবে। তারপর শুকনা কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর ভালো করে মুছে দিবে। তারপর কাফন পরাবে। ৩/৫ বারের পরিবর্তে ১ বার ধুলেও ফরজ আদায় হয়ে যাবে। মুর্দাকে কাফনের উপর রাখার সময় স্ত্রীলোকের মাথায়, পুরুষের মাথায় ও দাঁড়িতে আতর লাগাবে এবং কপাল, নাক, হাতের তালু, হাঁটু ইত্যাদি সাজদার জায়গায় কর্পুর লাগাবে। অনেকে কাফনে, কানে শরীরে আতর লাগায়, তা করবে না। মুর্দারের চুল আঁচড়াবে না, নখ কাটবে না।

পুরুষদের গোসল পুরুষগণ এবং মহিলাদের গোসল মহিলাগণ করাবে। পুরুষের গোসলের জন্য পুরুষ না পাওয়া গেলে, তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো মুহরিম স্ত্রীলোক গোসল দিতে পারবে না। কিন্তু মৃত স্ত্রীকে স্বামী স্পর্শ করতে পারবে না। তবে শুধু দেখা ও কাপড়ের উপর দিয়ে হাত লাগানো দুরস্ত যাবে। কোনো অপবিত্রা মহিলা মুর্দাকে গোসল দিতে পারবে না। যে অধিক নিকটতম আত্মীয় তার গোসল দেওয়া উচিত।

কাফন পরিধান

পুরুষের জন্য তিনখানা কাপড় দেওয়া সুন্নত। তা হলো– (১) চাদর, (২) ইযার, (৩) কোর্তা।

আর মেয়েদের জন্য উপরোক্ত তিনখানা ছাড়া আরও ২ খানা অতিরিক্ত কাপড় লাগবে। তা হলো–

(৪) সেরবন্দ, (৫) সিনাবন্দ।

(১) চাদর : শরীরের মাপ থেকে ১ হাত বেশি নিতে হবে।

(২) ইযার : মাথা হতে পা পর্যন্ত লম্বা। মাপ সমান নিতে হবে।

(৩) কোর্তা : লম্বায় মাইয়িতের মাপের দেড়গুণ হতে কিছু বেশি নিতে হবে, যাতে দ্বিগুণ করলে, নিসফে ছাক্ব (অর্ধগোছা) পর্যন্ত হয়। কোর্তার জন্য মধ্যখানে শুধু ফেড়ে ঢুকাতে পারলেই হবে। আস্তিন ও কল্লির প্রয়োজন নেই।

(৪) সেরবন্দ : ১২ গিরা চওড়া, ৩ হাত লম্বা।

(৫) সিনাবন্দ : ১২ গিরা চওড়া (বগলের নিচ থেকে রান পর্যন্ত পাশ হবে), ৩ হাত লম্বা। স্বাস্থ্যবান হলে লম্বা বেশিও লাগতে পারে।

পুরুষের কাফন পরানোর নিয়ম

প্রথমে চাদর, পরে ইযার, তারপর কোর্তা পিঠের অংশ বিছিয়ে সামনের অংশ মাথার কাছে গুছিয়ে রাখবে। তারপর কাফনে তিন বা পাঁচ বেজোড় আগরবাতি লোবানের ধোঁয়া দ্বারা ধুমায়িত করবে। তারপর মৃতব্যক্তিকে কাফনের উপর রেখে প্রথমে মাথার উপর দিয়ে কোর্তা গলায় প্রবেশ করাবে শরীর ঢেকে ঢাকনির চাদর খুলে ফেলবে। তারপর ইযার প্রথমে বামপাশ তারপর ডানপাশে দিয়ে ঢেকে দিবে। তারপর উপরোক্ত নিয়মে চাদর দিয়ে ঢেকে দিবে। সর্বশেষে কাপড়ের আঁচল অথবা মোটা সুতা দ্বারা মধ্যখান, পায়ের দিক ও মাথার দিক বেঁধে দিবে। যাতে খুলে না যায়। তবে কবরে নামিয়ে বাঁধন খুলে দিতে হবে।

নারীর কাফন পরানোর নিয়ম

প্রথমে চাদর, পরে ইযার, তারপর সিনা বরাবর সিনাবন্দ বিছাবে। তারপর কোর্তার নিচের অংশ বিছিয়ে উপরের অংশ মাথার কাছে গুছিয়ে রাখবে। তারপর মাইয়্যিতকে এনে কাফনের উপর শোয়াবে। কোর্তার সামনের অংশ মাথা দিয়ে গলায় ঢুকায়ে পরায়ে দিবে। ঢাকনির চাদর খুলে ফেলবে। মাথার চুল ভাগ করে দু-পাশ দিয়ে এনে কোর্তার উপরে বক্ষের উপর রেখে দেবে। তারপর সেরবন্দ দ্বারা মাথা পেঁচিয়ে মুখ খোলা রেখে চুলের উপর রেখে দিবে। তারপর সিনাবন্দ দুই পাশ থেকে বামপাশে প্রথমে উঠিয়ে ডানপাশ দিয়ে পেঁচিয়ে দিবে। তারপর ইযারের বামপাশ উঠায়ে ডানপাশ দিয়ে পেঁচিয়ে দিবে। তারপর চাদর উক্ত নিয়মে পেঁচাবে। তারপর দু'মাথা এবং মধ্যখানে বেঁধে দিবে। তবে কবরে নামিয়ে তা খুলে দিতে হবে।

সালাতুল জানাজা পড়ার নিয়ম

জানাজার সালাতের নিয়ম হলো, প্রথম তাকবিরে (তাকবিরে তাহরিমা) হাত কান পর্যন্ত তুলবে, পরের তাকবিরগুলোতে হাত বাধা অবস্থায় থাকবে। ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে ডান হাত ও বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে বাম হাত ছেড়ে দিবে।

জানাজার সালাতে কমপক্ষে তিন কাতার করা সুন্নত। মৃতকে কিবলার দিকে সম্মুখে রেখে বক্ষ বরাবর ইমাম দাঁড়াবেন।

জানাজার সালাতের নিয়ত–

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى صَلَاةَ الْجَنَازَةِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ الدُّعَاءُ لِـهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ .

জানাজা স্ত্রীলোকের হলে لِـهٰذَا -এর স্থলে لِـهٰذِهِ বলতে হবে।

বাংলা নিয়ত : আমি আল্লাহর ওয়াস্তে জানাজার ফরজে কিফায়া সালাত চার তাকবিরের সাথে এই ইমামের পিছনে আদায় করছি এং এই মৃতের জন্য দোআ করছি, আল্লাহু আকবার।

প্রথম তাকবির (তাকবিরে তাহরিমা)-এর পর সানা পড়তে হবে। সানা নিম্নরূপ–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ جَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰـهَ غَيْرُكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার, আপনি সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত, আপনার নাম বরকতপূর্ণ, আপনার মহত্ব অতি বিরাট, আপনার প্রশংসা অতি মহত্বপূর্ণ এবং আপনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।

সানা পড়ার পর দ্বিতীয় তাকবির উচ্চারণ করে দরুদে ইবরাহিমী পড়তে হবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ. اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অতঃপর তৃতীয় তাকবির উচ্চরণ করে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-নারীর জন্যে নিম্নের দোআটি পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِـحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَـنَا. اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلٰى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلٰى الْإِيْمَانِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত- মৃত, উপস্থিত- অনুপস্থিত, ছোট- বড়, পুরুষ- নারী সকলের গুনাহ ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যাদের জীবিত রাখবেন তাদের ইসলামের উপর রাখুন, আর যাদের আপনি মৃত্যু দেবেন, ইমানের সাথে মৃত্যু দিন।

পূর্ণ বয়স্ক লোকের জানাজা হলে, ইমাম সাহেব সশব্দে আর মুক্তাদি চুপে-চুপে, তৃতীয় তাকবির বলে (হাত না ছেড়ে) উক্ত দোআ পড়বেন।

নাবালেগ ছেলের জানাজা হলে তৃতীয় তাকবিরের পর নিম্নোক্ত দোআ পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا.

নাবালেগ মেয়ের জানাজা হলে তৃতীয় তাকবিরের পর নিম্নোক্ত দোআ পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَ اجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً.

চতুর্থ তাকবিরের পর সালাম বলতে হবে– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ

চতুর্থ তাকবিরের পর (হাত না উঠিয়ে) ইমাম সাহেব সশব্দে আর মুক্তাদি চুপে চুপে চতুর্থ তাকবির বলে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাতুল জানাজা শেষ করবে।

সালাতুল জানাজার পর দোআর বিধান

একজন মানুষ ইন্তেকাল করার পর তার জন্য সব সময় দোআ করাই উত্তম। সালাতুল জানাজাও মূলত মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ। তবে সর্ব বিবেচনায় দোআ নয়। তবে তার মধ্যে নামাযের সাদৃশ্য যেমন আছে, দোআও আছে। বিগলিত মনে একা বা সম্মিলিতভাবে যদি দোআ করা হয় তাতে নিষেধ নেই; বরং মৃত ব্যক্তির জন্য ফায়দা আছে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা জানাজার সালাত পড়ার পর খালেসভাবে তাঁর জন্য দোআ করবে। (সুনানু আবু দাউদ)

হজরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (ﷺ) এক ব্যক্তির জানাজার সালাতে শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে গমন করেন। কিন্তু সালাতে শরিক হতে পারেন নি। অতঃপর তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন–

إِنْ سَبَقْتُمُوْنِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تُسْبِقُوْنِيْ بِالدُّعَاءِ

অর্থ : তোমরা জানাজার সালাত আদায় করে ফেলেছ, কিন্তু আমার পূর্বে দোআ করো না। অর্থাৎ, আমাকে সাথে নিয়ে দোআ কর। (সারাখসী, আল মাবসূত)

দাফনের পর কিছুক্ষণ কবরের কাছে অপেক্ষা করা এবং মৃতব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দোআ করা ও কিছু কুরআন পড়ে সওয়াব বখশিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব।

ইন্তিকালের পর মৃতব্যক্তির আমল করার আর সুযোগ থাকে না। তার নেক সন্তান তার জন্য দোআ করলে, তাতেই সে লাভবান হবে। সন্তানের এ দোআর জন্য সময় বেধে দেওয়া হয়নি। মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে জানাজার পূর্বে, পরে কবরে রাখার সময়, কাফনের পূর্বে ও পরে সব সময় দোআ করা জায়েয।

মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ

যারা জীবিত আছেন, তাদের উচিত, তাদের পূর্বসুরী যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের জন্য দোআ করা। বিশেষ করে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও ওস্তাদ যারা কবরবাসী হয়েছেন, তাদের মাগফিরাতের জন্য সর্বদা দোআ করা কর্তব্য। এটা জীবিত

ব্যক্তির উপর মৃতব্যক্তির হক বা অধিকার। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার জন্য কিভাবে দোআ করতে হবে পবিত্র কুরআনে সে বিষয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাদের (পিতা-মাতা) প্রতি এমনিভাবে দয়া করুন, যেমনিভাবে তারা উভয়ে আমার প্রতি শিশুকালে দয়া করেছিলেন। (সুরা বনি ইসরাইল, ২৪)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

অর্থ : মৃত্যুর পর তিন প্রকারের আমল ব্যতীত মানুষের আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে-

(১) সদকায়ে জারিয়া,

(২) তার রেখে যাওয়া ইলম যার দ্বারা তার মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হয়,

(৩) নেক ও যোগ্য সন্তান যে তার জন্য দোআ করে। (সহিহ মুসলিম ও জামে তিরমিযি)।

দোআর পদ্ধতি

মৃতব্যক্তির জন্য দোআকে ইসালে সওয়াব (اِيْصَالُ ثَوَابٍ) বা সওয়াব রেসানি বলা হয়। হজরত সুফিয়ান সাওরি (রহ.) বলেনঃ জীবিত লোকেরা যেমন পানাহারের মুখাপেক্ষী অনুরূপ মৃতব্যক্তিরা দোআর মুখাপেক্ষী। তাই মৃতব্যক্তিদের জন্য সবসময় দোআ করতে হবে। এটা তাদের প্রতি জীবিতদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দোআর জন্য দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বিশেষ দিন ও সময় দোআ করলে তা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। যেমন : জুমুয়ার দিনে, আরাফার দিনে, লাইলাতুল বরাত, লাইলাতুল কদর ইত্যাদি।

মৃতব্যক্তি যে দিন ইন্তেকাল করেন সে দিনটি আত্মীয় স্বজনের কাছে স্মৃতি বিজড়িত দিন। ঐ দিন অন্তর নরম থাকে, মা-বাবা বা আত্মীয় স্বজনের জন্য চোখে পানি আসে, অন্য দিন তা হয় না। তাই ঐ দিন কুরআন খতম, মিসকিনদের খাওয়ানো, দোআ ও মিলাদ মাহফিল করলে জীবিতদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, তা মনকে আল্লাহমুখী করতে সহায়ক হয়। তবে ঐ দিনই দোআ করতে হবে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। আর ঐ দিন করলেও শরিয়তে নিষেধ নেই।

কবর যিয়ারতের সুন্নত পদ্ধতি

যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়া মুস্তাহাব। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার যিয়ারত করা, বিশেষ করে শুক্রবার যিয়ারত করা খুবই উত্তম কাজ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন :

مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَه وَ كُتِبَ بِرًّا.

অর্থ : যে প্রত্যক জুমুয়ার দিন তার পিতা-মাতা অথবা তাদের যে কোনো একজনের কবর যিয়ারত করবে তাকে ক্ষমা করা হবে এবং সদাচরণকারী সন্তানের তালিকাভুক্ত করা হবে। (বায়হাকী)

কবর যিয়ারত করলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। তাতে মন নরম হয় এবং গুনাহের কাজ পরিত্যাগের আগ্রহ জন্মে এবং অন্তর দুনিয়ার মায়া মহব্বত ছেড়ে আখেরাতের দিকে ধাবিত হয়।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ اُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قُبُوْرِ اُمِّهِ فَزُرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ.

অর্থ : আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম, মুহাম্মদ (ﷺ)কে তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত কর; কেননা তা আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (জামে তিরমিযি)

কবরস্থানে গিয়ে প্রথমে নিম্নের দোআটি পড়ে মৃতদের উদ্দেশ্যে সালাম করতে হয় :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ، اَنْتُم لَنَا سَلَفٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ طَبَعٌ وَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ يَرْحَمُ اللّٰهُ لَنَا وَ لَكُمْ.

অর্থ : হে কবরস্থিত মুমিন মুসলমান ব্যক্তিগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের পূর্বে গত হয়েছ। আমরা তোমাদের অনুসরণ করব এবং খোদার হুকুমে তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের প্রতি রহম করুন।

কবর যিয়ারতের নিয়ম হলো কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে মৃতের প্রতি মুখ করে দাঁড়ানো এবং মৃতের উদ্দেশ্যে সালাম করা। অতঃপর আদবের সাথে দাঁড়িয়ে সুরা ফাতিহা, সুরা ইখলাস, সুরা তাকাসুর অথবা কুরআন মাজিদের অন্য যে কোনো সুরা বা আয়াত মুখস্থ থাকলে তা পাঠপূর্বক এগারবার দরুদ শরীফ, ইস্তিগফার পড়ে কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুনাজাত দিয়ে সকল কবরবাসীর উপর সাওয়াব বখশিয়ে দেওয়া। অন্যান্য মুনাজাতে কিবলার দিকে ফিরে মুনাজাত দেওয়া মুস্তাহাব। কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে মৃতব্যক্তির দিকে ফিরে মুনাজাত দেওয়া উত্তম।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। জানাজার সালাত পড়া কী?

ক. ফরজ খ. ফরজে কেফায়া

গ. ওয়াজিব ঘ. সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ

২। জানাজার সালাতে সুন্নত কয়টি?

ক.৩ খ. ৪

গ. ৫ ঘ. ৬

৩। যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়ার হুকুম কী?

ক. সুন্নত খ. ওয়াজিব

গ. মাকরুহ ঘ. মুস্তাহাব

৪। মৃত্যুর পর মানুষের যে আমল জারী থাকে তা হচ্ছে -

i. সদকায়ে জারিয়া

ii. উপকারী ইলম

iii. নেক সন্তানের দোআ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

মাওলানা আবুল হাশেম জানাজার সালাত পড়াতে গিয়ে তিন তাকবির দিয়ে শেষ করেন।

৫। মাওলানা আবুল হাশেমের সালাত শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন হয়েছে?

ক. بَاطِلٌ খ. فَاسِدٌ

গ. مَكْرُوْهٌ ঘ. جَائِزٌ

৬। মাওলানা আবুল হাশেমের করণীয় হচ্ছে -

i. পুনরায় সালাত আদায় করা

ii. জানাজা শেষ করা

iii. দাফন কাজ সমাধা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. iii

গ. i ও ii　　ঘ. i, ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মাওলানা আকরাম সাহেব জানাজা সালাত শেষে হাত উঠিয়ে মৃতব্যক্তির জন্য দোআ করেন। দোআ শেষে শাহেদ আলি তাকে বললেন, হুজুর! জানাজা সালাতের পরে আপনি কেন দোআ করছেন? জানাজাই তো হচ্ছে মৃতব্যক্তির জন্য দোআ। আর কোনো দোআর প্রয়োজন নেই।

ক. কাফনে পুরুষের জন্য কয়খানা কাপড় দেওয়া সুন্নত?

খ. পিতা-মাতার জন্য পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নির্দিষ্ট দোআটি অর্থসহ লেখ।

গ. মাওলানা আকরাম সাহেবের কাজটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শাহেদ আলির বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

২। জায়েদ ঢাকায় চাকরি করে। গত কয়েকদিন আগে তার মা ইন্তেকাল করেছেন। তাই সে মায়ের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে বাড়ি আসে। এ কথা শুনে তার চাচা বলে মৃতব্যক্তির কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ নয়।

ক. জানাজায় প্রথম তাকবিরের পর কী পড়তে হয়?

খ. اِيْصَالُ الثَّوَابِ (ইসালে সওয়াব) বলতে কী বোঝ?

গ. জায়েদের কাজটি কেমন হয়েছে? ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জায়েদের চাচার বক্তব্যটি কি সঠিক? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ কর

ষষ্ঠ পাঠ

নফল সালাত

صَلَاةُ النَّوَافِل

সালাতুল ইশরাক (صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ)

ইশরাক (اَلْإِشْرَاقُ) শব্দের অর্থ উদিত হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া ইত্যাদি।

শরয়ি পরিভাষায় সূর্য উদয় থেকে ২৩ মিনিট অতিবাহিত হলে যে দুই বা চার রাকাত নফল সালাত আদায় করা হয়, তাকে ইশরাকের সালাত বলে।

ইশরাক সালাতের ফযিলত সম্পর্কে হজরত আনাস (ﷺ) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ.

অর্থ : যে ব্যক্তি জামাআত সহকারে ফজর সালাত আদায় করার পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার যিকির করে, এরপর দু রাকাত (নফল) সালাত পড়ে সে একটি হজ ও একটি ওমরার সওয়াব পাবে। হজরত আনাস (ﷺ) বলেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) তিনবার বলেছেন: পরিপূর্ণ হজ ও ওমরার সওয়াব পাবে। (জামে তিরমিযি)।

এ সালাতের নিয়ত নিম্নরূপ–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكَعَتَيْ صَلَاةِ الْاِشْرَاقِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللهُ أَكْبَرُ.

সালাতুল আওয়াবীন (صَلَاةُ الْاَوَّابِيْنَ)

সালাতুল আউয়াবিন (اَوَّابِيْنَ) আদায় করা মুস্তাহাব। মাগরিবের ফরয ও সুন্নত সালাতের পর দু রাকাত করে ছয় রাকাত সালাতকে সালাতুল আউয়াবিন বলে। সালাতুল আউয়াবিন আদায়ের ফযিলত সম্পর্কে আল্লাহর হাবিব (ﷺ) বলেন–

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً

অর্থ : যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত সালাত পড়বে এবং এর মাঝে কোনো খারাপ কথা বলবে না তার এই সালাতে ১২ বছরের ইবাদতের সমান সওয়াব হবে।

(জামে তিরমিযি, সহিহ ইবনি খুজাইমা ও সুনানু ইবনি মাজাহ)

এই সালাতের নিয়ত নিম্নরূপ–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكَعَتَيْ صَلَاةِ الاَوَّابِيْنَ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللهُ أَكْبَرُ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সালাতুল ইশরাক আদায় করলে কিসের সওয়াব হয়?

ক. সাওম খ. হজ

গ. ওমরা ঘ. হজ ও ওমরা

২। সালাতুল আওয়াবিন কয় রাকাত আদায় করতে হয়?

ক. চার খ. ছয়

গ. আট ঘ. দশ

৩। সালাতুল আওয়াবিন আদায় করলে -

i. বার বছর ইবাদতের সমান সওয়াব হয়

ii. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়

iii. বিপদ-মুসিবত দূর হয়ে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

হালিমা বেগম একজন ধার্মিক মহিলা। ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে তিনি যত্নবান। একটি বইতে সালাতুল ইশরাক এর বিবরণ পাঠ করে তিনি নিয়মিত সালাতুল ইশরাক আদায় করা শুরু করলেন। তা দেখে তার বোন সালমা তাকে বললেন, ফরয সালাত আদায় করলেই তো হয়। এত কষ্ট করে সালাতুল ইশরাক পড়ার প্রয়োজন কী? উত্তরে হালিমা বেগম বললেন, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নফল ইবাদতের অনেক প্রয়োজন।

ক. اَلْاِشْرَاقُ শব্দের অর্থ কী?

খ. সালাতুল আওয়াবিন বলতে কী বোঝায়?

গ. হালিমা বেগমের আমলটির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ঘ. সালমার মন্তব্যটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২০২১

ষষ্ঠ অধ্যায়
সাওম
اَلصَّـوْمُ
প্রথম পাঠ
আহকামুস সাওম

সাওমের পরিচয়

সাওম (اَلصَّـوْمُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা। সাওমকে ফার্সি ভাষায় রোযা (روزه) বলা হয়।

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে সর্বপ্রকার পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকাকে, শরিয়তের পরিভাষায় সাওম বলে।

সাওমে শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা পায়। ক্ষুধার্ত অনাহারী মানুষের দুঃখ কষ্ট উপলব্ধি করা যায়। মিথ্যা অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যায়।

সাওম এমন একটি ইবাদত যার অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাই এ বিশেষ ইবাদতের সওয়াব অনির্ধারিত। সাওম একমাত্র আল্লাহর জন্য, আল্লাহ নিজেই এর প্রতিদান দিবেন। যেমন হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন–

اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهٖ.

অর্থ : সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।

আত্মিক পরিশুদ্ধি ও রিপুসমূহকে দমন করার জন্য এ সিয়াম সাধনা সর্বকালীন। হজরত আদম (ﷺ) থেকে সাওমের বিধান ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।

সাওমের প্রকার

সাওম পাঁচ প্রকার। **যথা–**

(ক) ফরজ সাওম : যেমন রমযান মাসের সাওম

(খ) ওয়াজিব সাওম : যেমন মান্নতের সাওম

(গ) সুন্নত সাওম : যেমন আশুরার, আরাফার দিনের ও আইয়্যামে বিযের সাওম, শাওয়ালের ছয় সাওম।

(ঘ) নফল সাওম : সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শবে বরাতের সাওম।

(ঙ) হারাম সাওম : ইদুল ফিতর, ইদুল আযহা ও ইদুল আযহার পরের তিন দিন সাওম পালন করা হারাম।

সাওম যাদের ওপর ফরজ

রমযান মাসের সাওম পালন করা প্রত্যেক মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও বিবেকবান সুস্থ মানুষের উপর ফরজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর রমযানের সাওম ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্বপুরুষগণের উপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

(সুরা বাকারা, ১৮৬)

রমযান মাসের আমল

১. সাহরি খাওয়া সুন্নত, কমপক্ষে কয়েকটি খেজুর বা এক ঢোক পানি হলেও তা দ্বারা সাহরি গ্রহণ করলে এ সুন্নত আদায় হয়ে যায়।
২. সাওম অবস্থায় সংযমি হওয়া, যেমন : গিবত, মিথ্যা বলা, চোগলখুরী, হাঙ্গামা, রাগ ও বাড়াবাড়ি না করা সুন্নত। এ কাজগুলো সাওম পালনের বাইরেও করা ঠিক নয় তবে সাওম পালনের সময়ে তার থেকে দূরে থাকার বেশি বেশি চেষ্টা করা অপরিহার্য।
৩. সূর্যাস্তের পর তাড়াতাড়ি ইফতার করা।
৪. ইফতারের দোআ পাঠ করা।
৫. দিনের অধিকাংশ সময় দোআ, দরুদ, আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকা।
৬. বেশি বেশি দান-খয়রাত করা।
৭. রমযানের প্রতি রাতে তারাবির সালাত আদায় করা।
৮. তারাবির সালাতে কুরআন মাজিদ একবার খতম করা বা শ্রবণ করা।
৯. ইতিকাফ করা।

সাহরির পরিচয় ও মর্যাদা

সাহরি (سَحْرِى) শব্দটি আরবি। سَحْرٌ শব্দের অর্থ ভোর রাত। আর سَحْرِىٌّ অর্থ ভোর রাতের খাবার। ইসলামের পরিভাষায় সাওম পালন করার উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে যে খাবার ও পানীয় গ্রহণ করা হয়, তাকে সাহরি বলে।

সাহরি খাওয়া সুন্নত। নবি করিম (ﷺ) নিজে সাহরি খেতেন এবং অন্যদেরকেও সাহরি খাওয়ার তাকিদ করতেন। নবি করিম (ﷺ) বলেন−

তোমরা সাহরি খাও কেননা এতে তোমাদের জন্য বরকত রয়েছে।

মুসলমানদের সাওম এবং ইয়াহুদি নাসারাদের উপবাসের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তারা সাহরি খায় না, আর মুসলিমগণ সাহরি খায়। সুবহে সাদিক হতে সামান্য বাকি আছে এতোটা বিলম্ব করে সাহরি খাওয়া মুস্তাহাব। তবে সন্দেহের সময় পর্যন্ত দেরি করা মাকরুহ। কোনো কোনো মানুষ মনে করে- আযান না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া জায়েয, এটি একটি মারাত্মক ভুল ধারণা।

ইফতারের পরিচয় ও মর্যাদা

ইফতার (إِفْطَارٌ) শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ ভঙ্গ করা, ভেঙ্গে ফেলা। শরিয়তের পরিভাষায় সারাদিন সাওম পালন শেষে সূর্যাস্ত যাওয়ার পর পর খেজুর, পানি, দুধ, শরবত ইত্যাদি খাবারের মাধ্যমে সাওম ভঙ্গ করাকে ইফতার বলা হয়।

ইফতারের সময় এই দোআ পড়া সুন্নত−

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার জন্য সাওম পালন করেছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করছি।

ইফতার করা সুন্নত। খেজুর বা খুরমা দ্বারা ইফতার করা সুন্নত। সূর্যাস্তের পরে দেরি না করে ইফতার করা মুস্তাহাব। হাদিসে কুদসিতে আছে: আল্লাহ তাআলা বলেন- আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ বান্দাগণ যারা বিলম্ব না করে ইফতার করে।

অকারণে ইফতারে দেরি করা মাকরুহ। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে সুর্যাস্ত বোঝতে অসুবিধা হলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছু সময় বিলম্ব করতে হবে।

সাওম পালনকারীকে ইফতার করানো একটি বড় সাওয়াবের কাজ। রসুলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কোনো সাওম পালনকারীকে ইফতার করাবে সে ব্যক্তির জন্য তা মাগফিরাত ও

দোযখের আগুণ থেকে মুক্তি লাভের কারণ হবে এবং সে উক্ত সাওম পালনকারীর সমান সওয়াব লাভ করবে। এতে সাওম পালনকারীর সওয়াবে বিন্দুমাত্র কম করা হবে না।

সালাতুত তারাবিহ

তারাবিহ (تَرَاوِيْحُ) শব্দটি আরবি। এটি تَرْوِيْحَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ বিশ্রাম করা, আরাম করা, বসা। শরিয়তের পরিভাষায় মাহে রমযানে ইশার সালাতের পর অতিরিক্ত ২০ রাকয়াত সুন্নত সালাতকে 'সালাতুত তারাবিহ' বলা হয়। এ সালাতকে তারাবিহ নাম রাখা হয়েছে এ জন্যে যে, এতে প্রতি চার রাকায়াত অন্তর কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়। তারাবিহ সালাত মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.

অর্থ : যে ব্যক্তি মাহে রমযানে রাতে ইমানসহ সাওয়াবের আশায় কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে তারাবিহ পড়বে, তার অতীতের সমুদয় গুনাহ (সগীরা) মাফ হয়ে যাবে। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।

তারাবিহ সালাত আদায় করা নারী পুরুষ সকলের জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) রাতে সালাত আদায় করছিলেন- সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিলেন। এভাবে তিনদিন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর অনুসরণে সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে প্রিয়নবি (ﷺ) এ সালাত আদায় করলেন না। কারণ হিসেবে উল্লেখ করলেন–

اِنِّـيْ خَشِيْتُ اَنْ تَفَرَّضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

অর্থ : এই তারাবিহ সালাত তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি, (এ জন্য পড়িনি)।

তারাবিহ সালাতকে প্রিয়নবি (ﷺ) নিজেই সুন্নত ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেন–

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَـيْكُمْ وَ سَـنَنْتُ لَكُـمْ قِيَامَـه، فَمَـنْ صَـامَه وَ قَامَـه اِيْمَانًـا وَّ احْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِه كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّه.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা রমযান মাসের সিয়াম সাধনা তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন, আর আমি তোমাদের জন্য সুন্নতরূপে চালু করেছি রমযানের রাতে আল্লাহর ইবাদাতে দাঁড়ানো। কাজেই যে ব্যক্তি এ মাসে সিয়াম সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে এবং আল্লাহর সামনে কিয়াম (তারাবিহ) করবে ইমান ও আত্মোপলব্ধির সাথে, সে তার গুনাহ হতে এমন ভাবে নিষ্কৃতি লাভ করবে ঐ দিনের মতো যে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলো। (মুসনাদে আহমদ, সুনানু নাসায়ি)

তারাবিহ সালাতের রাকাতের সংখ্যা

তারাবিহ সালাত ১০ সালামের সাথে ২০ রাকাত পড়তে হয়। রসুলুল্লাহ (ﷺ) তারাবিহ ২০ রাকাত পড়েছেন। (সহিহ ইবনি খুযাইমা ও তালখীছ)

হজরত ওমর (رضي الله عنه)-এর খেলাফতকালে তারাবিহ ২০ রাকাত জামাতের সাথে আদায় শুরু হয়েছে। আজ পর্যন্ত মক্কা মুকাররমায় ও মদিনা মুনাওয়ারায় একই নিয়মে ২০ রাকাত তারাবিহ হয়ে আসছে। হজরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (رضي الله عنه) বলেন–

كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ شَهْرَ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةٍ.

অর্থ : হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه)-এর খেলাফতকালেই তাঁরা সবাই রমযান মাসে প্রতি রাতে ২০ রাকাত করে তারাবিহ সালাত আদায় করতেন।

তারাবিহ সালাত ২০ রাকাত। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা সম্মিলিত মত এটাই। এর বাইরে কিছু করার অবকাশ নেই। তবে হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ.

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) রাতে ৮ রাকাত সালাত আদায় করতেন।

এ আট রাকাত ছিলো রাতের নফল বা তাহাজ্জুদ। যা তিনি রমযান ব্যতীত অন্য মাসেও আদায় করতেন। সর্বপ্রথম যখন উবাই ইবনে কাব (رضي الله عنه)-এর মাধ্যমে মসজিদে নববিতে তারাবিহ জামাতের সাথে আদায় শুরু হয়, তখন ২০ রাকাত আদায় করা হয়। এ জন্য ২০ রাকাত তারাবিহ সুন্নত।

(ফতোয়ায়ে শামী, মাজমুআয়ে ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া)

তারাবিহ সালাতের নিয়ত

নিয়ত মনে মনে করলেই আদায় হয়। আরবি নিয়ত করা শর্ত নয়। তবে আরবি নিয়ত যদি শুদ্ধভাবে পড়া হয় তাতে সালাতের একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। আরবি নিয়ত নিম্নরূপ করা যায়–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

তারাবিহ সালাত জামাতে বা একাকী যেভাবেই আদায় হোক না কেন প্রতি দুই রাকাত পরপর অন্তত একবার নিচের দরুদ শরিফ পড়া উত্তম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا وَ شَفِيْعِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ .

চার রাকাত অন্তর বসে তিনবার নিম্নের দোআ পড়তে হয় –

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْهَيْبَةِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْجَبَرُوْتِ. سُبْحَانَ الْمَالِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَنَامُ وَ لَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوْحِ .

অর্থ : আমি একমাত্র সে প্রতিপালকের মহিমা ঘোষণা করছি, যিনি রাজাধিরাজ এবং ফেরেশতাদের অধিপতি, তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভাব, শক্তি, গৌরব ও সকল ক্ষমতার মালিক। আমি সেই চিরঞ্জীব মালিকের মহিমা ঘোষণা করছি, যিনি নিদ্রা যান না ও মৃত্যুবরণ করবেন না, তিনি পবিত্রতম, আমাদের রব। ফেরেশতাকূল ও রুহের রব।

চার রাকাত শেষে উল্লিখিত দোআর পর মুনাজাত করা উত্তম। রমযানের দোআ কবুলের মাস। বার বার দোআ করার সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানোই উত্তম। তবে ২০ রাকাত শেষ করেও একবার মুনাজাত করা যেতে পারে।

মুনাজাত নিম্নরূপ–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ. اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমার রহমতের মাধ্যমে তোমারই দরবারে জান্নাত চাই, আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভে তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে, জান্নাত ও জাহান্নামের স্রষ্টা, হে পরাক্রমশালী, হে মহা ক্ষমাশীল, হে অনুগ্রহকারী, হে গোপনীয়তা রক্ষাকারী, হে অসীম দয়ালু, হে প্রতাপশালী, হে স্রষ্টা, হে মঙ্গলদাতা, হে আল্লাহ! তোমার রহমত দ্বারা তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, হে রক্ষাকারী, হে রক্ষাকারী, হে রক্ষাকারী, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। اَلصَّوْمُ এর আভিধানিক অর্থ কী?

ক. বিরত থাকা　　খ. রোযা রাখা
গ. পরিশুদ্ধ হওয়া　　ঘ. জ্বালিয়ে দেওয়া

২। নিচের কোনটি সুন্নত সাওম?

ক. আশুরার　　খ. আরাফার
গ. শবে বরাতের　　ঘ. শুক্রবারের

৩। তারাবিহ্ সালাত কয় রাকাত পড়া সুন্নত?

ক. আট　　খ. বার
গ. ষোল　　ঘ. বিশ

৪। সাওম ফরজ হওয়ার হেকমত হচ্ছে, এতে -

i. শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা পায়
ii. অপরাধ বর্জনের প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়
iii. আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. i ও ii　　ঘ. i, ii ও iii

রাহেলা খাতুন রমযান মাসে সাহরি খেতে গিয়ে ফজরের আযান শুনতে পান। এরপরেও তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপে-চুপে পেট ভরে খেয়ে নেন।

৫। শরিয়তের দৃষ্টিতে রাহেলা খাতুনের সাওম কেমন হয়েছে?

ক. صَحِيْحٌ　　খ. بَاطِلٌ
গ. فَاسِدٌ　　ঘ. مَكْرُوْهٌ

৬। এমতাবস্থায় রাহেলা খাতুনের করণীয় হচ্ছে -

i. ফিদয়া দেওয়া

ii. আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া

iii. সাওম পুনরায় আদায় করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রাকিব এ বছর দাখিল পরীক্ষার্থী। রমযানে সাহরি খাওয়ার জন্য মা তাকে উঠতে বললে, সে বলল, আম্মু! পরীক্ষার জন্য আমাকে অনেক লেখাপড়া করতে হবে বিধায় এ বছর আমি সাওম পালন করতে পারব না। সাওম আমি প্রতিবছর পালন করার সুযোগ পাব, কিন্তু এই পরীক্ষা আমার জীবনে দ্বিতীয়বার আসবে না। কথাটি শুনে তার মা তাকে বললেন, সাওম প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

ক. সাওম কত প্রকার?

খ. সাওমের পরিচয় দাও।

গ. রাকিবের মায়ের বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাকিবের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। দিনভর কাজ করতে করতে খালেদ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই, তারাবিহ সালাতের পরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। শরীর ক্লান্ত থাকায় শেষ রাতে উঠতে দেরি হয়ে গেল। উঠে শুনলো ফযরের আযান চলছে। সাহরি না খেয়ে সাওম রাখলে সাওম হবে কি না এ ভাবনা করে আযান শেষ হওয়ার আগেই সে দুই গ্লাস পানি পান করে নিল।

ক. ইফতার করা কী?

খ. সালাতুত তারাবিহ বলতে কী বোঝায়?

গ. উক্ত পরিস্থিতিতে খালেদের সাওম হবে কি না? দলিলসহ ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. খালেদের ভাবনার যথার্থতা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় পাঠ
নফল সাওম

আইয়ামে বিযের সাওম

আইয়ামে বিয (اَيَّـامُ الْبِـيْضِ) এর অর্থ শুভ্র দিবসসমূহ। প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের এ তিন দিনকে একত্রে আইয়্যামে বিয বলা হয়। এ তিনদিন সাওম পালন করা মুস্তাহাব। হজরত কাতাদা (رضـ) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا اَنْ نَّصُوْمَ الْبِيْضَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَ اَرْبَعَ عَشَرَةَ وَ خَمْسَ عَشَرَةَ قَالَتْ وَ قَالَ هُنَّ كَهَيْاَةِ الدَّهْرِ.

রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখের বিযের সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন এ তিনটি সাওম পালনে পুরো বছর নফল সাওম পালনের সওয়াব হয়।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) হজরত আবু যর গিফারী (رضـ)-কে বলেন, হে আবু যর! যখন তুমি কোনো মাসে তিনদিন সাওম পালন করবে, তখন ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখ সাওম পালন করবে।

(জামে তিরমিযি ও সুনানু নাসায়ি)

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সাওম

সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করা মুস্তাহাব। রসুলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন। হজরত উসামা (رضـ) বলেন–

اِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ اَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنِيْنِ و يَوْمَ الْخَمِيْسِ.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ) সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন। তাঁকে এ দুই দিবসের সাওম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে ইরশাদ করেন : বান্দার আমল সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। (আবু দাউদ, ৩৩১)

তিরমিযি শরিফের বর্ণনায় রয়েছেঃ তিনি বলেন, আমি আশা করি আমার সাওম পালন অবস্থায় আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ হোক।

হজরত আবু কাতাদা (ﷺ) বলেন, হজরত নবি করিম (ﷺ)-কে সোমবারের সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেন–

فِيْهِ وُلِدْتُّ وَ فِيْهِ أُنْزِلَ.

অর্থ : ঐদিন আমার জন্ম হয়েছে এবং ঐ দিনই আমার উপর ওহি নাযিল হয়েছে। (মুসলিম)।

এ হাদিসে প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবি (ﷺ) সাওম পালনের মাধ্যমে তার মিলাদ ও কুরআন অবতীর্ণের স্মৃতিকে মর্যাদাবান করেছেন।

শবে বরাতের সাওম

শাবান চাঁদের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে পবিত্র শবেবরাত। এই রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা এবং দিনে সাওম পালন করা সুন্নত। এ মর্মে হজরত আলী (ﷺ) বলেন–

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا.

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন শাবান চাঁদের ১৪তারিখ দিবাগত রাত আসে তোমরা রাত জেগে ইবাদত কর এবং দিনে সাওম পালন কর। (ইবনে মাজা)

এ হাদিসে শবে বরাতকে লাইলুন নিসফি মিন শাবান বলা হয়েছে। এ রাতের ফযিলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা হাদিসে রয়েছে।

সুতরাং সকল মুমিন মুসলমানের উচিত, পবিত্র শবে বরাতের সাওম পালন করে ও বেশি বেশি ইবাদত করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিল করা।

সাওমের কাফ্ফারা

শুধু রমযানের সাওম ভঙ্গ হলে কাযা হবে, আর ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করলে কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে। রমযান ছাড়া অন্য সাওম ভঙ্গ হলে তার কাফফারা ওয়াজিব হবে না, তা ভুলক্রমে ভঙ্গ হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করা হোক। রমযানের কাযা সাওম পালন করার সময় তা ভঙ্গ হলে অথবা ভঙ্গ করলে তার কাফফারা ওয়াজিব হবে না। শুধু রমযানের সাওম ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

যে সমস্ত কারণে সাওমের কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হয়

যে সমস্ত কারণে সাওম ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। সাওম অবস্থায় সুস্থ শরীরে কোনো প্রকার খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করলে অথবা ওষুধ সেবন করলে সাওম ভঙ্গ হবে এবং এ প্রকার সাওমের কাযা ও কাফফারা উভয়ই আদায় করতে হবে।

২। ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম ভঙ্গ করলে সাওমের কাযা ও কাফফারা উভয়ই আদায় করতে হবে।

৩। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পেটে প্রবেশ করালে।

৪। সাওম পালন অবস্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণ করলে।

সাওমের কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি

সাওম পালন করা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত সাওম ভঙ্গ করলে সাওম পালনকারীর উপর অতিরিক্ত জরিমানা স্বরূপ যে কার্য সম্পাদন করতে হয় তাকে কাফফারা বলে। সাওমের কাফফারা হচ্ছে: একাধারে বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন সাওম পালন করা। মাঝখানে বাদ পড়লে আবার নতুন করে ৬০টি সাওম পালন করতে হবে। পূর্বেরগুলো এর সাথে যোগ করা হবে না।

কারও পক্ষে এরূপ সাওম পালন করা শরিয়ত সমর্থিত ওজরের কারণে সম্ভব না হলে কাফফারার সাওমের পরিবর্তে ৬০জন মিসকিনকে এক দিনে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে বা সে পরিমাণ খাদ্যের মূল্য গরিব মিসকিনকে দিতে হবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اَوْ اِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا-

অর্থ : সে যেন ধারাবাহিক পূর্ণ দুই মাস সাওম পালন করে অথবা ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ায়। (সুরা বাকারা ও মুজাদালা)

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান দৃষ্টিতে সাওমের উপকারিতা

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান দৃষ্টিতে সাওমের উপকারিতা অনেক। একমাস সাওম পালনের ফলে শরীরের অনেক অঙ্গ প্রতঙ্গের বিশ্রাম ঘটে। প্রতিদিন প্রায় পনের ঘণ্টা সময় এই বিশ্রামে লিভার, প্লীহা, কিডনী, মূত্রথলীসহ দেহের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ দীর্ঘ সময়ব্যাপী বেশ বিশ্রাম পায়।

সারাবছর দেহের অভ্যন্তরে যে বিষ সৃষ্টি হয় তা এক মাসের সিয়াম সাধনায় পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সাওম পালনে আলসার প্রদাহ উপশম হয়। ফুসফুসে কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা বা বাঁধার সৃষ্টি হলে সাওম তা দূর করে দেয়। সাওম আলস্য ও গোড়ামি দূর করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করা কী?

ক. সুন্নত খ. মুস্তাহাব

গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

২। ইচ্ছাকৃত একটি সাওম ভঙ্গ করলে কয়টি সাওম রাখতে হয়?

ক. ৩০ খ. ৪০

গ. ৫০ ঘ. ৬০

৩। সাওমের কাযা ও কাফফারা আদায় করতে হয়, যখন কেহ-

i. ইচ্ছাকৃত সাওম ভঙ্গ করে

ii. সাওম অবস্থায় ভুল করে কিছু খায়

iii. অসুস্থ অবস্থায় ঔষধ সেবন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

শাহিদা শবে বরাতের দিনে সাওম রেখেছেন জেনে তার দাদি তাকে সাওম ভঙ্গ করার জন্য বলে।

৫। শাহিদার উক্ত সাওমের হুকুম কী?

ক. ওয়াজিব খ. সুন্নত

গ. মুস্তাহাব ঘ. মাকরুহ

৬। এমতাবস্থায় শাহিদার করণীয় হচ্ছে-

i. সাওম পূর্ণ করা

ii. সাওম ভঙ্গ করা

iii. দাদির কথা মান্য করা

২০২৫

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

লতিফা বেগম একজন ধার্মিক মহিলা। ইসলামের প্রতিটি বিধান তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আদায় করেন। তিনি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সাওম রাখেন। এ দৃশ্য দেখে তার বোন হাজেরা তাকে বললেন, রমযানের সাওম আল্লাহ ফরজ করেছেন তা রাখলেই তো হয়। এত কষ্ট করে প্রতি সপ্তাহে সাওম রাখার প্রয়োজন কী? উত্তরে লতিফা বেগম বললেন, মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে নফল সাওমের বিকল্প নেই।

ক. কোন ইবাদতে আলসার প্রদাহ উপশম হয়?

খ. আইয়ামে বিযের সাওম বলতে কী বোঝ?

গ. লতিফা বেগমের আমলটির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ঘ. হাজেরার মন্তব্যটি কি সঠিক? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়

যাকাত

اَلزَّكَاةُ

প্রথম পাঠ

যাকাতের পরিচয় ও ফযিলত

যাকাতের পরিচয়

যাকাত(اَلزَّكَاةُ) শব্দটি باب تَفْعِيْل-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ اَلنُّمُوُّ তথা ক্রমবৃদ্ধি, اَلطَّهَارَةُ তথা পবিত্রতা লাভ করা, আধিক্য, পরিশুদ্ধি ও পরিপূর্ণতা লাভ করা ইত্যাদি। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কর্তৃক বছরান্তে তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (শতকরা ২.৫০ হারে) যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে প্রদান করাকে যাকাত বলে।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় যাকাত বলতে বোঝায় –

اَلْجُزْءُ الْمُقَدَّرُ مِنَ الْمَالِ الَّذِيْ فَرَضَهُ اللّٰهُ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ.

অর্থ : সম্পদের ঐ সুনির্ধারিত অংশ যা হকদারকে দেওয়া আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন।

যাকাতকে ফরয হিসেবে বিধান করার উদ্দেশ্য

১. কৃপণতা, সংকীর্ণতা, লোভ থেকে মানবজাতির আত্মাকে পুতঃপবিত্র করা।

২. দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতা, অসহায়দের অভাব পূরণ ও বঞ্চিতদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ।

৩. সাধারণ জনগণের মধ্যে আর্থিক সমতা বিধান ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

৪. ধনীদের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হওয়া রোধ করা, সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

যাকাতের শরয়ি মর্যাদা

যাকাত ইসলামি জীবন বিধানের অন্যতম মৌল স্তম্ভ ও অবশ্য পালনীয় ফরয ইবাদত। তাই আল্লাহর দেওয়া সম্পদ হতে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ তাঁরই নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাই একজন মুসলমানের কর্তব্য। ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ দূর করে সাম্য-মৈত্রীর বন্ধনে সবাইকে গ্রথিত করার যে ব্যবস্থা তারই নাম যাকাত।

কুরআনের আলোকে যাকাত

কুরআন মজিদে যাকাত শব্দটি সরাসরি ৩২বার এসেছে। اَلزَّكَاةُ মাসদার থেকে বিভিন্নরূপে সালাতের সাথে এসেছে ২৬ বার। যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

وَ اَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ.

অর্থ : সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর, আর রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।

(সুরা বাকারা, ৪৩)

হাদিসের আলোকে যাকাত

ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হল যাকাত। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

بُنِيَ الاِسْلاَمُ عَلى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّاللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَ اِقَامِ الصَّلاَةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حَجِّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থ : ইসলামের বুনিয়াদি স্তম্ভ পাঁচটি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল এ সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহ শরিফে হজ করা এবং রমযান মাসে সাওম পালন করা।

হজরত মাআয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামেনের গভর্নর নিযুক্ত করে রসুলে করিম (ﷺ) ঘোষণা দেন–

فَاعْلَمْهُمْ اَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِ هِمْ فَتَرُدُّ اِلى فُقَرَاءِ هِمْ.

অর্থ : তাদের জানিয়ে দাও যে, তাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ তাআলা সদকা (যাকাত) ফরয করে দিয়েছেন; যা তাদের ধনী লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করে গরিব বা ফকিরদের মাঝে বণ্টন করবে।

(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

যাকাতের প্রকার :

যাকাত প্রধানত চার প্রকার। যথা–

১। ফসলের যাকাত (যাকে পরিভাষায় ওশর বলা হয়)

২। গবাদি পশুর যাকাত

৩। সোনা, রুপা, নগদ টাকা ও ব্যবসা পণ্যের যাকাত

৪। সাওমের যাকাত (যাকে সদকাতুল ফিতর বলা হয়)

দ্বিতীয় পাঠ
যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহকে আরবিতে مَصَارِفُ الزَّكَاةِ বলে। যাকাত সকলকে দেওয়া যায় না। পবিত্র কুরআন মাজিদে কেবল আট শ্রেণির লোককে যাকাত দেওয়ার নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

অর্থ : এ সদকা (যাকাত) তো ফকির-মিসকিনদের জন্য, তাদের জন্য যারা সদকার কাজের জন্য নিয়োজিত, তাদের জন্য যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্থদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফরয বিধান এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।
(সুরা আত তওবাহ, ৬০)।

কুরআনের এ আয়াতের নির্দেশানুযায়ী যাকাত আট শ্রেণির মানুষ গ্রহণ করতে পারবে। তা হলো–

১। **ফকির (اَلْفُقَرَاءُ)** : যাদের সামান্য সম্পদ আছে কিন্তু তা দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ হয় না।

২। **মিসকিন (اَلْمَسٰكِيْنُ)** : যারা নিঃস্ব, নিজের অন্ন সংগ্রহ করতে পারে না। অভাবের তাড়নায় অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়। কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যারা কাজের অভাবে বেকার থাকতে বাধ্য এবং মানবেতর জীবন যাপন করে, তারাও মিসকিনদের মধ্যে গণ্য।

৩। **যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী (اَلْعٰمِلُوْنَ عَلَيْهَا)** : ইসলামি রাষ্ট্রে যাকাত সংগ্রহ, বিতরণ, হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করার জন্য যাদের নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের বেতন-ভাতা যাকাত তহবিল থেকে দেওয়া যাবে।

৪। **মুয়াল্লাফাতুল কুলূব (مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ)** : অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ব্যয় করা। এ খাতটি বর্তমানে রহিত হয়ে গেছে।

৫। রিকাব বা দাস মুক্তকরণ (فِي الرِّقَابِ) : ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দানের বিনিময়ে মুক্তি লাভের সুযোগ সৃষ্টি করলে, যাকাত ফান্ড থেকে সে অর্থ দিয়ে দাস মুক্ত করা যাবে। অথবা যাকাতের অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে তাকে মুক্ত করা যাবে।

৬। গারিমিন বা ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করা (اَلْغَارِمِيْنَ) : কেউ বৈধ কোনো কাজে ঋণ করে সে ঋণ শোধ করতে সক্ষম না হলে যাকাতের অর্থ দিয়ে তাকে ঋণমুক্ত করা যাবে। অপ্রত্যাশিত কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো কারণে ব্যবসা নষ্ট হয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে।

৭। ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় (فِيْ سَبِيْلِ اللهِ) : আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর পথে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৮। ইবনুস সাবিল বা নিঃস্ব পথিক (اِبْنُ السَّبِيْلِ) : মুসাফির বা প্রবাসি লোক স্বদেশে সম্পদ থাকলেও সফরে যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে।

তৃতীয় পাঠ

যার উপর যাকাত ফরজ

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী যাকাত ফরয হওয়ার কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যাদের উপর যাকাত ফরজ তাদের জন্য শর্ত হলো–

১। মুসলমান হওয়া

২। প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হওয়া

৩। সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া

৪। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া

৫। ঋণী না হওয়া

৬। পূর্ণ স্বাধীন হওয়া

৭। সম্পদ চন্দ্র মাসের হিসেবে এক বছর কাল স্থায়ী হওয়া

৮। নিসাব পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া : প্রকৃত প্রয়োজন বলতে বোঝায় এমন সব জিনিস যার উপর মানুষের জীবন যাপন ও ইজ্জত আবরু নির্ভরশীল। যেমন : খানা-পিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ,

বসবাসের ঘর-বাড়ি, পেশাজীবী লোকের পেশা সংক্রান্ত যন্ত্র-পাতি, যানবাহনের পশু, সাইকেল, মোটর ইত্যাদি এ সকল গৃহস্থলি সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর যাকাত ফরজ হবে না।

৯। সম্পদ বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিসাব পরিমাণ থাকা।

চতুর্থ পাঠ

যাকাত আদায় না করার পরিণাম

নির্দিষ্ট সম্পদের মালিক হয়েও যদি কেউ যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পূর্ণ সম্পদ শুধুমাত্র অপবিত্রই হয় না বরং এ জন্য ভয়াবহ পরিণামও অবধারিত রয়েছে। যাকাত আদায় না করার কঠিন ও কঠোর পরিণতির কথা কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

অর্থ : আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে অথচ তা আল্লাহর পথে (যাকাত) ব্যয় করে না, তাদেরকে শুনিয়ে দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া হবে তাদের ললাটে, পাঁজরে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে। বলা হবে এই সম্পদই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করে রাখতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। (সুরা তওবা, ৩৪-৩৫)।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন–

مَنْ اٰتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّيْ زَكَاتَه مُثِّلَ لَه مَالُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعُ لَه زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ يَعْنِيْ شَدَقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَامَالُكَ وَ اَنَا كَنْزُكَ .

অর্থ : আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন সে যদি তার যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদ কিয়ামতের দিন মারাত্মক বিষধর সর্পের আকার ধারণ করবে, যার কপালের উপর দুটি কালো চিহ্ন কিংবা দুটি দাঁত বা দু'টি শৃঙ্গ থাকবে। কিয়ামতের দিন এ সর্পকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সাপটি তার মুখের দুই পাশে, দুই গালের গোশত খেতে থাকবে আর বলতে থাকবে আমিই তোমার ধন-সম্পদ। আমিই তোমার সঞ্চিত বিত্ত-সম্পত্তি। (সহিহ বুখারি ও নাসায়ি)।

উল্লিখিত আয়াতে কারিমা ও হাদিসে নববির বাণীর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত আদায় না করার শাস্তি ও পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তাছাড়া এমন কঠিন শাস্তি অপেক্ষমান যার থেকে পালাবার কোনোই পথ নেই।

পঞ্চম পাঠ
যেসব সম্পদের যাকাত ফরজ

যেসব সম্পদে যাকাত আদায় করা ফরজ হয়, সেগুলো হলো–

১। **স্বর্ণ ও রৌপ্যঃ** ৭.৫ তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৫২.৫ তোলা বা ৬১২.৫৩ গ্রাম রৌপ্য অথবা তার সমপরিমাণ সম্পদ ১ বৎসর পর্যন্ত যদি মালিকানায় থাকে।

২। **উট, গরু ও ছাগল :** উট কমপক্ষে ৫টি হলে, গরু ৩০টি হলে, ছাগল বা ভেড়া ৪০টি হলে যাকাত ফরয হয়

৩। **ফসল ও ফলের যাকাত :** উৎপাদিত ফসলের যাকাত, যেমন : গম, যব, ছোলা, চাল, ডাল, খেজুর, আলু, যয়তুন ইত্যাদি কম হোক কিংবা বেশি হোক তাতে যাকাত দিতে হবে। সেচের মাধ্যমে হলে ২০ ভাগের এক ভাগ, বৃষ্টির, নদীর বা স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত পানি থেকে উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে।

৪। **ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থ সম্পদ।**

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। اَلزَّكَاةُ শব্দের অর্থ কী?

ক. বৃদ্ধি পাওয়া খ. কমে যাওয়া
গ. অর্জিত হওয়া ঘ. গ্রহণ করা

২। اَلْغَارِمِيْنَ বলে যাকাতের কোন খাতকে বোঝানো হয়েছে?

ক. দরিদ্র খ. অসহায়
গ. ঋণগ্রস্ত ঘ. মুসাফির

৩। গরুর যাকাতের নিসাব কয়টি?

ক. ২০ খ. ৩০

গ. ৪০ ঘ. ৬০

৪। যাকাত অনাদায়ীর সম্পদ কিয়ামতে তাকে -

i. সাপ হয়ে কামড়াবে

ii. জাহান্নামে নিয়ে যাবে

iii. আগুনের দাগ দিবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

আফযাল সাহেব তার যাকাতের সমুদয় অর্থ মসজিদ নির্মানের কাজে ব্যয় করে বললেন, মসজিদ নির্মাণ সর্বাধিক সওয়াবের কাজ।

৫। শরিয়তের দৃষ্টিতে আফযাল সাহেবের যাকাত আদায় কেমন হল?

ক. صَحِيْحٌ খ. بَاطِلٌ

গ. مُسْتَحَبٌّ ঘ. مَكْرُوْهٌ

৬। আফযাল সাহেবের করণীয় ছিল -

i. যাকাতের ব্যয় ক্ষেত্র জানা

ii. হকদারকে যাকাত দেওয়া

iii. মা-বাবাকে দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শারাফাত ও আরাফাত দুজনই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। উভয়েরই ব্যাংকে লক্ষ টাকা জমা রয়েছে। শারাফাত প্রতিবছর রমযান মাস এলে টাকা হিসাব করে যাকাত আদায় করেন। কিন্তু আরাফাত যাকাত আদায় করেন না। উপরন্তু তিনি বলেন, যাকাত আদায় করলে সম্পদ কমে যাবে। ব্যবসা করে আগে কোটিপতি হই।

ক. مِسْكِيْنٌ শব্দের অর্থ কী?

খ. যাকাত ফরযের উদ্দেশ্যে বর্ণনা কর।

গ. শারাফাতের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আরাফাতের বক্তব্য সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মতামত দাও।

২। নির্বাচন সামনে রেখে আলম মিয়া ধনী-দরিদ্র সকলের মাঝে যাকাতের অর্থ বিতরণ করলেন। বিষয়টি এলাকার প্রখ্যাত মুফতি বুরহান উদ্দীন জানতে পেরে আলম মিয়াকে নির্ধারিত খাতে যাকাত দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু, তিনি তার পরামর্শ না মেনে ইচ্ছেমতো যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন এবং বললেন,‘যাকাতের উদ্দেশ্যেই হলো জনকল্যাণ’। সুতরাং জনকল্যাণমূলক যে কোনো কাজে যাকাতের অর্থ বণ্টন করলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

ক. রৌপ্যের যাকাতের নিসাব কত?

খ. নিসাবের ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন বলতে কী বোঝায়?

গ. আলম মিয়ার যাকাত আদায়ের বিষয়টি কেমন হয়েছে? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আলম মিয়ার উক্তির সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের স্বপক্ষে দলিল দাও।

অষ্টম অধ্যায়

আল আতইমা ওয়াল আশরিবা

اَلْأَطْعِمَةُ وَالْأَشْرِبَةُ

اَلْأَطْعِمَةُ وَالْأَشْرِبَةُ-এর পরিচয়

আতইমা (اَلْأَطْعِمَةُ) শব্দটি طَعَامٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ খাদ্য সামগ্রী। আর আরশিবা (اَلْأَشْرِبَةُ) শব্দটি شَرَابٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ পানীয় বস্তুসমূহ। ইসলামে মেহমানদারি সুন্নত। প্রত্যেককে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মেহমানদারি করতে হবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه.

অর্থ : যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে।
(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।

এখানে 'মেহমানের সম্মান' বলতে তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করা, উত্তম খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করাকে বোঝানো হয়েছে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে কেউ প্রশ্ন করলো : ইমান কী? তিনি বললেন : অপরকে আহার করানো ও সালামের চর্চা করা।

হজরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন– যে ঘরে মেহমান আসে না, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

খাওয়ার অনুষ্ঠানে ফকির ও গরিবদেরকে বাদ দিয়ে যেনো শুধু ধনীদের দাওয়াত দেওয়া না হয়। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

شَرُّ الطَّعَامِ اَلْوَلِيْمَةُ يُدْعٰى اِلَيْهَا الاَغْنِيَاءُ دُوْنَ الْفُقَرَاءِ.

অর্থ : সেই বিয়ের খাওয়ার অনুষ্ঠান সবচেয়ে নিকৃষ্ট যাতে গরিবদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَ رَسُوْلَه وَ مَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَّ خَرَجَ مُغِيْرًا.

অর্থ : যে ব্যক্তি আমন্ত্রণ পেয়ে দাওয়াতে যায়নি সে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নাফরমানি করেছে। আর যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে খেতে গিয়েছে সে চোর হিসেবে প্রবেশ করেছে এবং লুটেরা (ডাকাত) হিসেবে বেরিয়ে এসেছে। (আবু দাউদ)।

খানাপিনার অপচয় করা যাবে না। অপচয় করা কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لاَ تُسْرِفُوْا.

অর্থ : তোমরা খাও, পান কর, অপচয় করো না। (সুরা আরাফ, ৩১)

কতগুলো বৈধ খাদ্য ও পানীয়র নাম

যে সকল খাদ্য বা পানীয় কুরআন সুন্নাহ হারাম বা মাকরুহ ঘোষণা দিয়েছে সেগুলো ছাড়া সবই হালাল। যেমন : রুটি, ভাত, গোশত, মাছ, ডিম, গম, যব, ডাল, শব্জী, চিনি, গুড়, খৈ, মুড়ি, ফল-মূল, আদা, রসুন, পেয়াজ, হলুদ-মরিচ, লবণ ইত্যাদি।

পানীয়ের মধ্যে পানি, দুধ, দই, মধু ইত্যাদি।

হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধ বিষয়ে আল কুরআনের মূলনীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। ইরশাদ হয়েছে–

وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

অর্থ : তিনি (রসুলুল্লাহ ﷺ) তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ। (সুরা আরাফ, ১৫৭)।

কতগুলো হারাম খাদ্য ও পানীয়

যে সকল খাদ্য ও পানীয় কুরআন ও সুন্নায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলোই হারাম খাদ্য ও পানীয়। হারাম খাদ্য অনেক, যেমন : শুকরের মাংস, রক্ত, মৃত জন্তু, আল্লাহর নাম না নিয়ে অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করা পশু ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন –

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالاَزْلاَمِ ذَالِكُمْ فِسْقٌ .

অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবাইকৃত পশু, শ্বাস রোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শিং এর আঘাতে মৃত জন্তু, এবং হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু; তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছো তা বৈধ। আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা, জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা এ সবই পাপ কাজ।

(সুরা মায়িদাহ, ৩)

পানীয়র মধ্যে অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হলে তা হারাম হয়ে যায়। বিষ ও বিষ জাতীয় সকল বস্তুই হারাম। বিষ নয় কিন্তু ক্ষতিকর এমন বস্তুও হারাম। যেমন : কাদা, মাটি, পাথর, কয়লা ইত্যাদি। মাদক দ্রব্য যেমন : গাঁজা, আফিম, কোকেন, ভাঙ্গ, হিরোইন, ভদকা, ফেন্সিডিল ও পেথিড্রন ইত্যাদি পান করা ও ব্যবহার করা হারাম।

এ সকল খাদ্য ও পানীয় ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি হয়, যেমন : যক্ষা, ব্রংকাইটিস, ক্যান্সার, হৃদরোগ, জন্ডিস, হেপাটাইটিস, সিরোসিস, কিডনী রোগ, আলসার, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি।

ইসলাম মানুষের ক্ষতি হতে পারে এমন সব বস্তু খাওয়া ও পান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন : মদ্যপান সকল অশ্লীলতা ও কবিরা গুনাহের উৎস।

(কানযুল উম্মাল, ৫/৩৪৯)।

ধূমপান চরম ক্ষতিকর এবং বদ অভ্যাস, এটি স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। অর্থের অপচয় ঘটায়। এ কারণে এটিও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৩/২৪৬)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ইসলামে মেহমানদারীর হুকুম কী?

ক. ওয়াজিব খ. সুন্নত

গ. মুস্তাহাব ঘ. মুবাহ

২। খানা-পিনার অপচয় করা কোন ধরণের গুনাহ?

ক. কবিরা　　খ. সগিরা

গ. শিরকি　　ঘ. নেফাকি

৩। ধূমপান -

i. একটি বদ অভ্যাস

ii. স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে

iii. অর্থ অপচয় করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

আসিফ ব্যবসা করতে যেয়ে সুবাস দাসের সাথে সম্পর্ক হয়। একদিন সুবাস দাস তাকে বলি দেওয়া ছাগলের গোশত এনে দেয়।

৪। আসিফের জন্য উক্ত গোশত খাওয়ার বিধান কী?

ক. হালাল　　খ. হারাম

গ. মাকরুহ　　ঘ. মুবাহ

৫। এমতাবস্থায় আসিফের করণীয় হচ্ছে -

i. সম্পর্ক বর্জন করা

ii. গোশত না খাওয়া

iii. ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মকবুল সাহেবের বাড়িতে তার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান। তিনি এলাকার নামি দামি সকলকে এ বিয়েতে দাওয়াত দেন। কিন্তু গরিব প্রতিবেশী রজব আলিকে বিয়ের দাওয়াত দেননি। বিয়ের জমকালো আয়োজন দেখে রজব আলির ছোট ছেলে মকবুল সাহেবের বাড়িতে আসলে তার ছেলে আশিক তাকে তাড়িয়ে দেয়।

ক. اَلْأَطْعِمَةُ (আতইমা) শব্দের অর্থ কী?

খ. হারাম খাদ্য ও পানীয়র পরিচয় দাও।

গ. মকবুল সাহেবের কাজটি কেমন হয়েছে? ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মকবুল সাহেবের ছেলে আশিকের কাজটি কেমন হয়েছে? আলোচনা কর।

তৃতীয় ভাগ

আখলাক বা চরিত্র

اَلْأَخْلَاقُ

প্রথম অধ্যায়

উত্তম চরিত্র

اَلْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ

প্রথম পাঠ

উন্নত চরিত্র অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, একটি মানবিক অপরটি পাশবিক। মানবিক দিককে উন্নত চরিত্র বা اَلْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ বলে। এর দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। উন্নত চরিত্র অর্জন না করে মানুষ যখন নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করে তখনই তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত হয়ে যায় এবং কখনো কখনো তার চেয়েও নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

অর্থ : তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তারা পথভ্রষ্ট। (সুরা আরাফ, ১৭৯)

তখন তারা হয় মানবকুলের অমানুষ। তাই প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

অর্থ : তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট। (মিশকাত, ৪৩১)

তাই দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের জন্য প্রতিটি মানুষের সচ্চরিত্রবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অপমান, ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হবে।

উন্নত চরিত্র অর্জনের পদ্ধতি

উন্নত চরিত্র অর্জনের জন্য নিচের গুণাবলি অর্জন করা প্রয়োজন–

১। ইমানের ক্ষেত্রে ইখলাস বা নিষ্ঠা

২। ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক মুক্ত হওয়া ও একাগ্রতা সৃষ্টি

৩। ইহসান তথা যথা সময়ে, যথা নিয়মে ও সর্বোত্তমভাবে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলিতে ভূষিত হওয়া

৪। তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন

৫। মন মানসিকতায় ভালো কাজের চেতনা সৃষ্টি করা

৬। কৃত অন্যায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তওবা করা

৭। অতীত কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আত্মোপলব্ধি সৃষ্টি করা

৮। চিন্তা গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও সম্পাদন করা

৯। তাওয়াক্কুল বা প্রচেষ্টার পর সবকিছু আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা

১০। সবর তথা সর্বাবস্থায় নীতি ও আদর্শে অবিচল থাকা

১১। হায়া বা লজ্জাবোধ থাকা

১২। সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি, বিনয় প্রকাশ ইত্যাদি মৌলিক গুণাবলি অর্জন করা

১৩। আচরণের ক্ষেত্রে ভদ্রতা, শালিনতা, আদব রক্ষা করা

১৪। উন্নত চরিত্র অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো উন্নত চরিত্রের অধিকারী আদর্শ শিক্ষকের সাহচর্যে থেকে সৎ গুণাবলি অনুশীলন ও চরিত্রসমূহ অভ্যাসে পরিণত করা

১৫। সর্বক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের যিকির ও ফিকিরে থাকা

দ্বিতীয় পাঠ

আল্লাহ ও রসুল (ﷺ)-এর প্রতি মহব্বত

আল্লাহ তাআলা স্রষ্টা, মনিব, রহমান, রহিম, রিযিকদাতা, জান-মাল সবকিছুর একমাত্র মালিক তিনি। এ বিশ্বাস যাদের আছে, আল্লাহর প্রতি তাদের মহব্বত, আল্লাহর রসুলের প্রতি তাদের ভালবাসা হবে অকৃত্রিম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

অর্থ : যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা অত্যন্ত প্রবল। (সুরা বাকারা, ১৬৫)

যে ইবাদতে মহব্বত নেই তা প্রাণহীন। প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি ভালবাসা মুমিনের ইমান এবং ইমানের মূল। তিনি নিজেই ইরশাদ করেন–

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে কেউ-ই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ ও রসুল (ﷺ)-কে ভালোবাসা প্রমাণ হলো–

১. তাঁদের হুকুম পালন করা
২. তাঁদের নিষেধ থেকে ফিরে থাকা
৩. সবসময় আল্লাহর যিকির ও ফিকিরে থাকা এবং প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা
৪. আল্লাহর নিদর্শনসমূহ-যথা বায়তুল্লাহ ও প্রিয়নবি (ﷺ)-এর স্মৃতি যেমন রওযা মোবারক যিয়ারতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা
৫. আল্লাহ ও রসুলের কাছে যারা প্রিয় তাদেরকে ভালবাসা এবং যারা দুশমন তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা।

তৃতীয় পাঠ

আল্লাহর ওলিদের প্রতি মহব্বত ও তাদের অনুসরণ

وَلِيٌّ শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, সাহায্যকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত। নবি ও রসুলগণের রেখে যাওয়া দায়িত্ব পালন করে আল্লাহ তাআলার বন্ধুতে উন্নীত হয়েছেন তারাই ওলি। ওলির পরিচয় দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ، لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

অর্থ : যারা ইমান এনেছে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সু-সংবাদ। (সুরা ইউনুস, ৬৩–৬৪)

ওলির প্রধান দুটি গুণ হলো, ইমান ও তাকওয়া। ওলিগণ জাহেরি জ্ঞান দানের সাথে সাথে অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জনেরও বাস্তব জ্ঞান দান করেন। কালব বা অন্তরকে পবিত্র করার জন্যই ওলিগণের সাহচর্য প্রয়োজন। তাদের প্রতি মহব্বত রেখে তাদেরকে অনুসরণ করেই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সন্তুষ্টি অর্জন করা সহজ হয়। তাই ওলিগণকে ভক্তি, তাযিম ও মহব্বত করা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য অতীব প্রয়োজন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানব সন্তানের বৈশিষ্ট্য কয়টি?

ক. ১টি খ. ২টি

গ. ৩টি ঘ. ৪টি

২। اَلْاَخْلَاقُ শব্দের অর্থ কী?

ক. স্বভাব খ. চরিত্র

গ. আচরণ ঘ. সদ্ব্যবহার

৩। প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি মহব্বত রাখা কী?

ক. ইসলাম খ. ইমান

গ. আমল ঘ. ইহসান

৪। ওলির প্রধান প্রধান গুণ হচ্ছে -

i. তাকওয়া ও আমল

ii. ইমান ও তাকওয়া

iii. ইহসান ও আমল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৫। মুমিন হচ্ছে -

i. আমলের প্রতি মহব্বত রাখা

ii. আল্লাহর প্রতি মহব্বত রাখা

iii. প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি মহব্বত রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

শাকের আখলাকে হাসানা বা উন্নত চরিত্রের ধার ধারে না এবং ওলি ও বুযুর্গানেদীনকে অসম্মান ও তুচ্ছ জ্ঞান করে। তার বাবা তাকে বুযুর্গানেদীনের সাহচর্যে যেতে উপদেশ দিলে সে অস্বীকার করে।

৬। শাকের উন্নত চরিত্র গ্রহণ না করে ইসলামের কোন বিধান লংঘন করেছেন?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৭। শাকেরের বাবার উপদেশটি -

i. কুরআনের

ii. সুন্নাহর

iii. সামাজিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। হাসান ও মুরাদ সাহেব শিক্ষকতা করেন। তারা দুজনই আবেদ। হাসান ইসলামের নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান ও মহব্বত রাখেন। মুরাদ এ সবের তোয়াক্কা করেন না। হাসান মুরাদকে বায়তুল্লাহ ও রওযায়ে নববি যেয়ারতের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগের কথা বললে মুরাদ বললেন, কাবায় হজ করতে যেতে পারেন তবে, মদিনায় মসজিদে নববিতে সালাত আদায় করা যায় কিন্তু রওজা মোবারক যেয়ারতে কোন ফায়দা নেই। হাসান বললেন, এরূপ বলা মারাত্মক বেয়াদবি ও গুনাহের কাজ।

ক. বায়তুল্লাহ শরিফ ও রওজা মোবারক যেয়ারতের হুকুম কী?

খ. মদিনার রওযা শরিফ যেয়ারত কেন গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা কর।

গ. মুরাদের বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

ঘ. হাসানের বক্তব্য সঠিক কিনা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২। ইহসান গ্রামের সহজ সরল মানুষ। শুক্রবারের জুমুয়ার খুতবায় রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর শান-মান ও মুহাব্বতের বিষয়ে ইমাম সাহেবের আলোচনা শুনে প্রিয়নবির প্রতি দরুদ-সালাম বেশি বেশি পড়ে এবং চোখের পানি ফেলে কাঁদে। তার চাচা সামুদ গাজী কান্না দেখে হাসি-ঠাট্টা করে।

ক. আল্লাহ ও রসুলকে মহব্বতের প্রমাণ হিসেবে ৩টি বিষয় লেখ।

খ. রসুলের প্রতি মহব্বতের গুরুত্ব বুঝিয়ে লেখ।

গ. সামুদ গাজীর আচরণটি শরিয়তের দৃষ্টিতে কীরূপ হয়েছে? উল্লেখ কর।

ঘ. রসুল (ﷺ)-এর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের পরিণাম কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ পাঠ
তাকওয়া

তাকওয়া (اَلتَّقْوٰى) শব্দটি আরবি। এর অর্থ আল্লাহর ভয়, পরহেযগারি, দীনদারি, সংযমি। শরিয়তের পরিভাষায় তাকওয়া হলো– حِفْظُ النَّفْسِ عَمَّا يُؤْثَمُ

অর্থ : যার দ্বারা গুনাহ হয় এমন কথা, কাজ থেকে নিজ আত্মাকে মুক্ত রাখা। (আল মুফরাদাত)

আল কুরআনে তাকওয়া পরিভাষাটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

১। اَلْخَوْفُ وَالْخَشْيَةُ বা ভয়ভীতি, ২। اَلْعِبَادَاتُ বা বন্দেগি, ৩। تَرْكُ الْمَعْصِيَةِ বা পাপ ছেড়ে দেওয়া, ৪। اَلتَّوْحِيْدُ বা একত্ববাদ ও ৫। اَلْإِخْلَاصُ বা কথা ও কাজে নিষ্ঠা

তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়ে আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

অর্থ : ওহে যারা ইমান এনেছ ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না। (সুরা আলে ইমরান, ১০২)

মুত্তাকিগণ সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট সম্মানী। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থ : তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক পরহেযগার। (সুরা হুজুরাত, ১৩)

বিদায় হজের ভাষণে প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন–

اِتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا إِذَا أَمَرَكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

অর্থ : তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর, রমযানে সাওম পালন কর; মালের যাকাত আদায় কর, নেতার আনুগত্য কর, তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ কর।

(জামে তিরমিযি)

হজরত আলি ইবনে আবু তালিব (রা.) বলেন–

التَّقْوٰى هُوَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيْلِ وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيْلِ، وَالرِّضَا بِالْقَلِيْلِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِيومِ الرَّحِيل.

অর্থ : তাকওয়া হলো মহান আল্লাহকে ভয় করা, অবতীর্ণ কিতাব অনুযায়ী আমল করা, স্বল্পে তুষ্ট থাকা এবং বিদায় দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। (দালিলুস সায়েলিন, ১১৪)

তাই আল্লাহর ভয় মনের মধ্যে স্থান দিয়ে পরকালে নিজের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহিতার কথা চিন্তা করে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবিব সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতের সাথে কর্মসম্পাদন করাই হবে একজন মুত্তাকির কাজ। আর মুত্তাকির পুরস্কার হল জান্নাত।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

অর্থ : মুত্তাকিদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রয়েছে ।

পঞ্চম পাঠ

ত্যাগ

ত্যাগ (اَلْاِيْثَارُ) বলতে অপর মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণের জন্য নিজে কষ্ট স্বীকার করা এবং তাকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেওয়াকে বোঝায়।

মহানবি (ﷺ)-এর সাহাবিগণের জীবন এ ধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাঁদের ত্যাগের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

অর্থ : তারা নিজের উপর অন্যান্যদের (প্রয়োজন) কে অগ্রাধিকার দেয়। যদিও তারা রয়েছে অনটনের মধ্যে। (সুরা হাশর, ০৯)।

মহানবি (ﷺ) ও তাঁর সাহাবিগণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন- 'ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।'

ষষ্ঠ পাঠ

ক্ষমা

ক্ষমা (اَلْعَفْوُ) শব্দের অর্থ মাফ করা, প্রতিশোধ না নেওয়া। ইসলামের পরিভাষায় প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে অপরাধীকে মাফ করে দেওয়ার নামই ক্ষমা।

আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা মহা ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।

ক্ষমা আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহ তাআলা মানুষকে অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। মানুষের সকল সুখ শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানুষ মূর্খতাবশত শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর কথা ভুলে যায়। তার হুকুম অমান্য করে, তার সাথে শিরক করে, তার নিআমত অস্বীকার করে। এরপর যখন তারা নিজেদের ভুল বোঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন।

সপ্তম পাঠ

বিনয় প্রকাশ

বিনয় (اَلتَّوَاضُعُ) শব্দের অর্থ হলো, অন্যের তুলনায় নিজেকে ছোট জ্ঞান করা এবং অন্যদেরকে বড় মনে করা। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে হলে বিনয়ী হওয়া আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে কুরআনে মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

অর্থ : রহমানের (আল্লাহর) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে।

(সুরা ফোরকান, ৬৩)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلا رَفَعَهُ اللّٰهُ

অর্থ : কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিনয় অবলম্বন করে, তবে মহান আল্লাহ তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন। (সহিহ মুসলিম)

বিনয় মুমিনের জিন্দেগির ভূষণ। পক্ষান্তরে অহংকার হচ্ছে পাপীষ্ঠ হওয়ার নিদর্শন।

অষ্টম পাঠ

শিক্ষকের প্রতি আদব

শিক্ষক মানুষের অন্ধকার জীবনে আলোর দিশা দেন। মাতা-পিতা জন্মদাতা হিসেবে সম্মানের পাত্র। কিন্তু, মাতা-পিতা সকলকে মানুষ বানাতে পারেন না। শিক্ষকই মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। আল্লাহ তাআলা হজরত আদম (ﷺ)-কে জ্ঞান দান করে ফেরেশতাদেরকে সে জ্ঞানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা অপারগতা প্রকাশ করায় আদম (ﷺ) তাদেরকে জ্ঞানের কথাগুলো শেখালেন। আর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন, আদম (ﷺ)-কে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন হিসেবে সেজদা করার। তাই শিক্ষকের প্রতি সম্মান দেখানো নৈতিক দায়িত্ব।

সম্মান প্রদর্শনের কয়েকটি পদ্ধতি হলো–

১. শিক্ষককে পিতৃতুল্য মনে করা।

২. তাঁর আদেশ-নিষেধকে গুরুত্বের সাথে পালন করা।

৩. যথাসাধ্য শিক্ষকের খেদমত করা।

৪. এমন কোনো কাজ না করা বা কথা না বলা যাতে তিনি মনক্ষুন্ন হন।

৫. শিক্ষকের সামনে কথা বলার সময় বিনয়ের সাথে বক্তব্য উপস্থাপন করা।

৬. শিক্ষক সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আদবের সাথে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা।

৭. শিক্ষক অসুস্থ হলে তাঁর সেবা করা, অভাবী হলে তাঁকে সাধ্যমত সহায়তা করা।

৮. সবসময় শিক্ষকের জন্য দোআ করা।

তাই, যার কাছে একটি হরফও শিখবে সেই সম্মানিত শিক্ষক। তার তা'যিম করা, সেবা করা ছাত্রের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নবম পাঠ

অন্যের ঘরে প্রবেশের অনুমতি

অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি গ্রহণ মহান আল্লাহর নির্দেশ ও আদব প্রদর্শনের অন্যতম দিক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থ : হে মুমিনগণ! অন্যের ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না। প্রবেশ করার সময় ঘরের বাসিন্দাদের সালাম দেবে। এ আদব প্রদর্শন তোমাদের জন্য উত্তম আচরণ। বিষয়টি স্মরণ রাখা আবশ্যক। (সুরা আন নূর, ২৭)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَلإِسْتِيْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَ إِلاَّ فَارْجِعْ

অর্থ : অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে প্রথমবার সাড়া না পেলে দ্বিতীয়বার, তাতেও সাড়া না পেলে তৃতীয়বার অনুমতি চাইবে। তৃতীয়বারও সাড়া না পেলে ফিরে আসবে।

অনুমতি চাওয়ার সময় ভেতর থেকে যদি বলে 'কে'? জবাবে নিজের নাম ও পরিচয় বলতে হবে। কলিং বেল থাকলে প্রথমে আস্তে কল করবে। তাতে সাড়া না পেলে আরেকটু জোরে বেল চাপ দিতে হবে, তাতেও সাড়া না পেলে জোরে চাপ দিতে হবে। তাতেও সাড়া না পেলে ফিরে আসতে হবে। বাড়িওয়ালা রাজি না থাকলে জোর করে বিরক্ত করে তার ঘরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

দশম পাঠ

সৎ সঙ্গ লাভ

মানুষ সামাজিক জীব। সে একা থাকতে পারে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঙ্গী প্রয়োজন। সঙ্গী কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থ : তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হও।(সুরা তওবা, ১১৯)

কথা, কাজে, আচরণে যিনি সততা ও সত্যবাদীতার আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তার সাথী হলে নিজেও সৎ হবে। প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُـخَالِلُ

অর্থ : ব্যক্তি তার বন্ধুর স্বভাবে প্রভাবিত হয়, তাই কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তা নিয়ে ভাবা উচিত। (আবূ দাউদ, তিরমিযি)

হজরত ওমর (رضي الله عنه) বলেন–

وَحْدَةُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيْسِ السُّوءِ

অর্থ : খারাপ সঙ্গী গ্রহণের চেয়ে একা থাকা অনেক ভালো। (দালিলুস সায়েলীন, ১৫৫)

মাওলানা রুমী (رحمه الله) বলেন– -

صحبت صالح ترا صالح کند + صحبت طالح ترا طالح کند

অর্থ : নেককার লোকের সঙ্গী হলে তোমাকে নেককার বানাবে। অসৎ লোকের সঙ্গী হলে তোমাকে অসৎ বানিয়ে ছাড়বে। বাংলায় বলা হয় - **'সৎ সঙ্গে সর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'**

তাই মিথ্যাবাদী, অসৎ, খেয়ানতকারী, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের হুকুম অমান্যকারীর সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। হাক্কানী আলেম ও ওলি-আওলিয়ার সাথী হতে হবে। তাতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত।

একাদশ পাঠ

এতিমের প্রতি দয়া

ছোটকালে যাদের পিতা মারা যায় তাদেরকে এতিম বলে। এতিমদের প্রতি সহায়তা দান জান্নাতি মানুষের স্বভাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

অর্থ : তারা দুনিয়ার জীবনে খাদ্যদ্রব্যের প্রতি নিজেদের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকিন, এতিম ও বন্দিদের আহার প্রদান করে। (সুরা আদ্ দাহর, ৮)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ

অর্থ : আমি এবং এতিমের জিম্মাদার ব্যক্তি একত্রে জান্নাতে থাকব। (সহিহ্ বুখারি)

এতিমের সম্পদ কুক্ষিগত করাকে জাহান্নামের আগুন খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন মহান আল্লাহ্। তাই এতিমের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা, তাদের দায়িত্ব নেওয়া একজন মুসলিমের অন্যতম কর্তব্য।

দ্বাদশ পাঠ
মোবাইল ফোনের ব্যবহার

মোবাইল ফোন বিজ্ঞানের এক অনন্য আবিষ্কার। এটি ভালোভাবে ব্যবহার করাই একজন আদর্শ মানুষের কর্তব্য। মোবাইল ফোন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম নিম্নে বর্ণিত হলো–

১. ডায়াল করার আগে সঠিক ফোন নম্বর জেনে নিতে হবে।

২. Wrong নম্বরে call চলে গেলে বিনয়ের সাথে দুঃখিত (Sorry) বলতে হবে।

৩. মোবাইল ফোনের রিংটোনে এমন কোনো গান, কথা বা বাজনা থাকবে না, যাতে গুনাহ্ হয় এবং সমাজের কাছে অশালীন বলে চিহ্নিত হয়।

৪. মোবাইল ফোনে যিনি কল দেবেন তাকেই প্রথম সালাম দিতে হবে, যিনি রিসিভ করবেন তিনি সালামের জবাব দেবেন।

৫. "রিং" হওয়ার পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফোন ধরতে চেষ্টা করতে হবে।

৬. মোবাইল ফোনে কথা সংক্ষেপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭. যাকে কল দেবে তার মর্যাদা ও অবস্থান অনুযায়ী আদবের সাথে কথা বলতে হবে এবং জবাব দিতে হবে।

৮. শিক্ষকের জন্য ক্লাস চলাকালীন মোবাইল ব্যবহার বেআইনি।

৯. প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করা দোষণীয়।

১০. সালাত আদায়ের পূর্বে অবশ্যই মোবাইল বন্ধ রাখতে হবে। যদি ভুলে বন্ধ করা না হয়, যদি সালাতে রিং টোন বেজে উঠে, তাহলে সালাতের দিকে খেয়াল রেখে একহাত দিয়ে তা বন্ধ করতে হবে, এতে সালাতের ক্ষতি হবে না। যদি বন্ধ করা না হয়, তাহলে অনেক লোকের সালাত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ত্রয়োদশ পাঠ

অসচ্চরিত্র পরিহার

মানুষের মধ্যে এমন কিছু স্বভাব রয়েছে যা কদর্য ও অপছন্দনীয়। এ জাতীয় স্বভাব-চরিত্রকে আখলাকে সাইয়্যেআ (اَلْأَخْلَاقُ السَّيِّئَةُ) বা কদর্য স্বভাব বলা হয়।

কদর্য স্বভাব হলো, মিথ্যা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, কৃপণতা, গিবত, প্রতারণা, চোগলখুরী বা কুটনামি, হিংসা, ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা, পদ ও সম্পদের মোহ, ওয়াদা ভঙ্গ, বিদ্রূপ করা, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা, অতিরিক্ত ও বেহুদা কথা বলা ইত্যাদি। ভালো স্বভাব-চরিত্র অর্জনের প্রচেষ্টা ইমানী দায়িত্ব। অনুরূপ মন্দ চরিত্র থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা জিহাদের শামিল। মন্দ চরিত্র মানুষের বংশগৌরব, পদ-পদবী, অর্থ-বিত্ত, সনদ-ডিগ্রি সব কিছুকে নিঃশেষ করে দেয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে :

Money is lost nothing is lost, Health is lost something is lost but character is lost everything is lost.

সকল মহৎ গুণের এক মহান আদর্শ রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

অর্থ : মুসলিমদের মাঝে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ইমানের অধিকারী তারাই যারা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।

(জামে তিরমিযি)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। اَلتَّقْوٰى অর্থ কী?

ক. আল্লাহর ভয় খ. জাহান্নামের ভয়

গ. কবরের আযাবের ভয় ঘ. লোক লজ্জার ভয়

২। اَلْعَفْوُ শব্দের অর্থ কী?

ক. সাহায্য চাওয়া খ. প্রতিশোধ না নেওয়া

গ. উদারতা প্রদর্শন ঘ. কল্যাণ কামনা করা

৩। اَلتَّوَاضُعُ এর অর্থ কী?

ক. অন্যের তুলনায় নিজেকে ছোট জ্ঞান করা   খ. বিনীত আচরণ প্রদর্শন করা

গ. সবাইকে ভালোবাসা   ঘ. সদাচরণ করা

৪। كَافِلُ الْيَتِيْمِ এর অর্থ কী?

ক. এতিমের অভিভাবক   খ. এতিমের পিতা

গ. এতিমের বন্ধু   ঘ. এতিমের যিম্মাদার ব্যক্তি

৫। ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠ ও সুন্দর জীবন যাপনের মূলশক্তি হচ্ছে -

i. তাকওয়া

ii. আমল

iii. ইবাদত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

ইরফানের প্রতিবেশী ইহসান। ইহসানের বাড়ি থেকে প্রধান রাস্তায় যাওয়ার পথ নেই। ইরফানের মা একজন আলেমা। তিনি ইহসানকে চলাফেরার জন্য পথ দেওয়ার উপদেশ দেয়। ইরফান ইহসানের জন্য নিজের জায়গা দিয়ে চলাচলের পথ করে দেন।

৬. ইরফান মায়ের উপদেশ শুনে ইসলামের কোন বিধানটির আমল করে?

ক. ফরজ   খ. সুন্নত

গ. মুস্তাহাব   ঘ. মুস্তাহসান

৭. এমতাবস্থায় ইহসানের উচিৎ–

i. ইরফানকে এড়িয়ে চলা

ii. ইরফানের প্রয়োজনে সহযোগিতা করা

iii. ইরফানের মাকে সম্মান করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জাহিদ একজন কর্মচারী। সে করিমের পোল্ট্রিফার্মে কাজ করে। সে দীনদার কিন্তু করিম তাকওয়া অবলম্বন করে না। অন্যায় ব্যবসা করে। মাঝে মাঝে জাহিদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। জাহিদের ভুল ঔষধ খাওয়ানোর কারণে দুইশত মুরগী মারা যায়। করিম ভীষণ রাগান্বিত হয়। জাহিদ কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে করিম প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়।

ক. তাকওয়ার হুকুম কী?

খ. উত্তম চরিত্র বা আখলাকে হাসানা বলতে কী বোঝ?

গ. জাহিদের সাথে করিমের দুর্ব্যবহার ও তার ব্যবসা ইসলামের দৃষ্টিতে কীরূপ হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. করিমের ক্ষমা করার বিষটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. হিশাম ও হোসাইন দাখিল সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। হিশাম ক্লাসে ওস্তাদের দরসে অমনোযোগিতা ও মেজাজ প্রদর্শন করে। হোসাইন সকল শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সে হিশামকে বিনয়ী ও ওস্তাদের সাথে আদব প্রদর্শন করার কথা বলে। হিশাম তা গ্রহণ করে না। একদা ওস্তাদ হিশামকে বিনয়, আদব, সৎসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নসিহত করেন।

ক. اَلتَّوَاضُعُ কী?

খ. শিক্ষকের আদব কী বুঝিয়ে লেখ?

গ. হিশামের আচরণ ইসলামি শরিয়তে কীরূপ হয়েছে উল্লেখ কর।

ঘ. ওস্তাদের নসিহত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

৩. আহসান ও আকরাম একই শ্রেণিতে পড়ে। আকরামের বাবা নেই। মা অনেক কষ্টে সংসার চালান। আকরাম চঞ্চল। প্রায়ই বন্ধুদের বাসায় যায় কিন্তু অনুমতি নেয় না। মোবাইলে অপ্রয়োজনীয় কল করে অর্থ অপচয় করে। আহসান আকরামের আচার আচরণ ও আখলাক পরিবর্তনের কথা বলে। বিপদ-আপদে আকরামের পরিবারকে সহযোগিতা করে। আকরাম এতিম বলে পাশে থাকে, কিন্তু আকরাম আহসানের সাথে ভাল ব্যবহার করে না।

ক. অসচ্চরিত্র কী?

খ. এতিমের প্রতি আচরণ কীরূপ বুঝিয়ে লেখ?

গ. আকরামের আচরণ শরিয়তের কোন বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে?

ঘ. আহসানের আচরণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অসচ্চরিত্র

اَلْأَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ

প্রথম পাঠ

বিদ্রূপ করা

বিদ্রূপ করাকে আরবিতে (اَلسِّخْرِيَّةُ) বলে। বিদ্রূপ করা নিঃসন্দেহে একটি নিন্দনীয় কাজ। ইসলাম আত্মসম্মানবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে। অহংকারবশত অন্যকে ঘৃণা করা কিংবা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ। কাউকে হেয় করার ইচ্ছায় বিদ্রূপ করাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা এর মাধ্যমে মানুষের অধিকার বিনষ্ট হয় এবং সম্মানহানী হয়। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ.

অর্থ : কোনো সম্প্রদায় অন্য কোনো সম্প্রদায়কে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না। (সুরা হুজুরাত, ১১)

যাকে বিদ্রূপ করা হয়, সে আল্লাহর নিকট বিদ্রূপকারীর অপেক্ষাও প্রিয়তর হতে পারে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) কখনো কাউকে বিদ্রূপ করেন নি। তিনি অন্যের ত্রুটি না খোঁজার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

وَ لَا تَحَاسَدُوْا وَ لَا تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا.

অর্থ : তোমরা পরস্পরে হিংসা পোষণ করো না, পরস্পরে রাগারাগি করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। (সহিহ বুখারি)

মূলকথা, বিদ্রূপ করার কুফল থেকে ব্যক্তি ও সমাজ মুক্ত হলে শান্তি আসে। কাউকে বিদ্রূপ না করে মানবিক মর্যাদা দান করাই মনুষ্যত্ব।

দ্বিতীয় পাঠ

কৃপণতা

কৃপণতা (اَلْبُخْلُ) মানব চরিত্রের একটি মারাত্মক রোগ। যে রোগ সুস্বাস্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সমাজে মানুষকে হেয় করে, মান-সম্মানে আঘাত হানে।

আল্লাহ তাআলা বখিলদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِه فَأُلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আর যারা নিজ নিজ আত্মাকে কার্পণ্য থেকে মুক্ত করতে পেরেছে তারাই কল্যাণ পথের পথিক। তোমরা কখনও এরূপ ধারণা করো না যে, যারা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতে কার্পণ্য করেছে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে, বরং তা তাদের জন্য ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক। কিয়ামত দিবসে তারা যে বস্তুতে কার্পণ্য করেছে তা তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। (সুরা আলে ইমরান, ১৮০)

হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন–

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَ لاَ بَخِيْلٌ وَّ لاَ مَنَّانٌ.

অর্থ : ধোকাবাজ, কৃপণ, এবং উপকার করে খোটা দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

শেখ সাদী (রহ.) তাই বলেন–

بخیل ار بود زاهد بحر و بر * بهشتی نباشد بحکم خبر .

বাখিল আর বুওয়াদ যাহেদ বাহরও বার * বেহেশতি না বাশাদ বে হুকমে খবর।

কৃপণ জগত সেরা জাহেদ-আবেদ হলে * বেহেশ্‌ত পাবে না তবু হাদিসেতে বলে।

এ কার্পণ্য রোগের চিকিৎসা করতে হবে নিম্নরূপ পদক্ষেপের মাধ্যমে–

১। নিজের কামনা-বাসনা লোভ সংযত করতে হবে।

২। মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে।

৩। যেসব বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন মৃত্যুবরণ করেছেন, তারা যে কোনো সম্পদ কবরে নিয়ে যেতে পারেননি তা নিয়ে চিন্তা ফিকির করতে হবে।

৪। বেশি বেশি কবর যিয়ারত করতে হবে।

তৃতীয় পাঠ
রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা

রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা (اَلرِّيَاءُ) একটি নিন্দনীয় গুণ। একজন ইমানদারের কথা, কাজ, চিন্তা-চেতনা সবকিছু হতে হবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রসুল (ﷺ)-কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আত্মপ্রচার, লোক দেখানো ইবাদত বা কর্মে কোনো মূল্য নেই। রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত ও কর্মে ইখলাস ও আন্তরিকতা থাকে না। এসব ইবাদত ও কর্মের দ্বারা আল্লাহর ভয় ও রসুল (ﷺ) এর মহব্বত হাসিল হয় না।

আল্লাহ তাআলা রিয়াকারীদের অভিশম্পাত করে বলেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ.

অর্থ: সুতরাং ধ্বংস ঐ সকল সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। (সুরা মা'উন, ৪-৬)

হজরত নবি করিম (ﷺ) বলেন– আল্লাহর নিকট 'জুব্বুল হুযন' হতে আশ্রয় ও মুক্তি প্রার্থনা কর। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন- 'জুব্বুল হুযন' কী? রসুলে করিম (ﷺ) জবাবে বলেন, 'জাহান্নামের একটি প্রান্তর যা রিয়াকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।'

রিয়া বলতে সহজে বোঝতে হবে যে, ব্যক্তি কোনো নেক আমল করার ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য পোষণ করবে যে, লোকে তার এ সমস্ত আমল দেখুক, মানুষের মধ্যে তার সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাক। রিয়া চাল-চলনে হতে পারে, কথা ও কাজে হতে পারে।

রিয়া থেকে বাঁচার উপায় নিজেকে আল্লাহর একজন নিকৃষ্ট বান্দা মনে করা। মৃত্যুর ভয় মনে সদা জাগরূক রাখা, লোক দেখানো ইবাদত যে কবুল হবে না বরং জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে তা মনে প্রাণে ভালোভাবে উপলব্ধি করা।

চতুর্থ পাঠ

গিবত বা পরনিন্দা

গিবত (اَلْغِيْبَةُ) শব্দটি غَيْبٌ থেকে উৎসারিত। এর শাব্দিক অর্থ হলো অনুপস্থিত থাকা। গিবত শব্দের অর্থ কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করা, যদিও তার মধ্যে উক্ত দোষটি বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের কাছে তাঁর এমন দোষের কথা বলা, যা শুনলে মনে কষ্ট পাবে বা লজ্জা পাবে। গিবত শ্রবণকারী, তাতে মনোযোগ প্রদানকারী, উৎসাহ প্রদানকারী সকলেই গিবতকারীর সমপরিমাণ গুনাহগার হবে।

গিবতের অপকারিতা

গিবত সামাজিক সুখ শান্তি বিনষ্ট করে। পরস্পরের মধ্যে ভাল সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। বন্ধুত্ব নষ্ট করে, পরস্পরের আস্থা বিনষ্ট হয়, সমাজে কলহ, ঝগড়া-বিবাদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ইসলামি শরিয়াতে গিবত কবিরা গুনাহ ও হারাম। আপন মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করা যেমন জঘন্য, গিবত করাও তেমনি জঘন্য ও ঘৃণার কাজ।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন–

وَ لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَ يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ.

অর্থ : আর তোমরা একে অপরের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে ভালোবাস ? আর তা তোমরা অবশ্যই অপছন্দ কর। (সুরা আল হুজুরাত, ১২)

গিবত থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়

(১) গিবতকারী নিজের কর্মে লজ্জিত হওয়া, এজন্যে তওবা করা ও অনুতপ্ত হওয়া।

(২) যার গিবত করেছে তার কাছে অনুতাপের সাথে ক্ষমা চাওয়া।

(৩) যার গিবত করেছে তার জন্য ইস্তিগফার করা, তার প্রশংসা করা এবং তার জন্য দোআ করা।

পঞ্চম পাঠ

লোভ ও লালসা

লোভ ও লালসাকে আরবিতে (الطَّمَعُ والحِرصُ) বলে। الطَّمَعُ শব্দের অর্থ অন্তরের প্রবল আশা এবং الحِرصُ অর্থ লালসা। মন্দ স্বভাবের অন্যতম হচ্ছে লোভ ও মোহ।

অধিক লোভ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এটি মানুষকে গুনাহের দিকে ধাবিত করে। লোভ লালসা বহু পাপের উৎস। লোভী ব্যক্তি তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার জন্যে বৈধ-অবৈধ কোনো কিছুরই সে তোয়াক্কা করে না। চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাকের মূলে রয়েছে লোভ। যশ, খ্যাতি, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সীমাহীন লোভ মানুষ কে বিপদগামী করে। লোভ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

ষষ্ঠ পাঠ

হিংসা

হিংসাকে আরবিতে হাসাদ (اَلْحَسَدُ) বলে। এর অর্থ ক্রোধ, শত্রুতা, হিংসা। নবি করিম (ﷺ) বলেন–

اِنَّ الْحَسَدَ لَيَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থ : হিংসা নেকিসমূহকে এমনভাবে ভক্ষণ করে যেমন অগ্নি কাঠকে জ্বালিয়ে ফেলে।

অন্যের নিয়ামতে বিনাশ হয়ে নিজে তার মালিক হওয়ার কামনা করাই হাসাদ বা হিংসা। আর কারো নিয়ামতের বিনাশ কামনা না করে নিজের জন্যও অনুরূপ নিআমত কামনা করাকে গিবতাহ বা আকাঙ্ক্ষা বলে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

মুমিন ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করে হিংসা করে না।

হিংসা একটি মারাত্মক মানসিক রোগ। মানব সৃষ্টির পর হিংসার কারণেই সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়। ইবলিস হজরত আদম (ﷺ)-এর পদ-মর্যাদা দেখে হিংসা করে। ফলে সে অভিশপ্ত হয়। হিংসার বশবর্তী হয়ে হজরত আদম এর ছেলে কাবিল তার আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে। হিংসায় অহংকার সৃষ্টি করে, আর অহংকার পতন ঘটায়। হিংসা বর্জনকারী আল্লাহর প্রিয় এবং জান্নাতের অধিবাসী হবে।

সপ্তম পাঠ

ক্রোধ

ক্রোধকে আরবিতে (غَضَبٌ) বলে। ক্রোধ বা রাগ হচ্ছে অন্তরে সুপ্ত একপ্রকার আগুন। যেমন ছাইয়ের নিচে লুকিয়ে থাকে অঙ্গার। ক্রোধ আগুনের অংশ, যে আগুন দ্বারা শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেক নির্দয় ও নিষ্ঠুর আচরণ করে ফেলে। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ক্রোধের কারণে অনেক সময় লজ্জিত ও অপমানিত হতে হয়। তাই ক্রোধ সম্বরণ করা উচিত। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

সবচেয়ে বড় বীর সে ব্যক্তি, যে রাগের সময় তার নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

অর্থ : এবং যখন তারা ক্রোধান্বিত হয়, তখন তারা ক্ষমা করে দেয়। (সুরা শূরা, ৩৭)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ক্রোধের চিকিৎসা হলো اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়া।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন, যখনই তোমাদের কারো রাগের উদ্রেক হবে, তখন দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে বসে পড়বে, বসা অবস্থায় থাকলে শুয়ে পড়বে। এতেও ক্রোধ না থামলে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা অযু অথবা গোসল করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। السحرية শব্দের অর্থ কী?

ক. খেলা করা খ. তামাশা করা

গ. বিদ্রূপ করা ঘ. তোষামোদ করা

২০২৩

২। البخل মানব চরিত্রের কী?

ক. ভূষণ খ. স্বভাব

গ. আখলাক ঘ. মারত্মক

৩। ইসলামি শরিয়তে الغيبة কী?

ক. ছগিরা গুনাহ খ. শিরকি গুনাহ

গ. কবিরা গুনাহ ঘ. মরা ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা।

৪। الحسد অর্থ কী?

ক. হিংসা খ. লোভ

গ. লালসা ঘ. অহংকার

৫। ক্রোধ হচ্ছে -

i. মারত্মক ব্যাধি

ii. অন্তরের সুপ্ত একপ্রকার আগুন

iii. কঠোর মনোভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সলিম কলিমের দোকানের কর্মচারী। বিশ্বস্ত মনে করে কলিম সলিমের কাছেই দোকানের টাকা রাখে। একদা সলিম মোটা অংকের টাকা নিয়ে পালাতে চেষ্টা করলে কলিম তাকে লোভ না করার উপদেশ দেয়।

৬. সলিম ইসলামের কোন বিধান লঙ্ঘন করেছে?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৭. কলিম সলিমকে নসিহত করলেন-

i. না পালানোর

ii. লোভ না করার

iii. হিংসা না করার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও iii　　ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রফিক একজন বড় ব্যবসায়ী। বাড়ি, গাড়ি, বাগানসহ শিল্পকারখানার মালিক। স্বভাবে লোকটি কৃপণ, লোভী, আচরণে হিংসুক। অধীনস্তদের উপরে কঠোর। দান খয়রাত করে নামমাত্র লোক দেখানো। আলেম ওলামার উপর তার তাচ্ছিল্যভাব। ইমাম সাহেব একদা তার বাসায় দাওয়াতে এলে রফিককে নসীহত করেন।

ক. البخل অর্থ কী?

খ. লোক দেখানো ইবাদত বা কর্মে কোন মূল্য নেই কথা বুঝিয়ে লেখ?

গ. কারও প্রতি অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্লতা প্রদর্শনে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ কর।

ঘ. রফিকের আচরণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

২। সালমান শিল্পপতি ও কোটিপতি। তার বাড়ির পার্শ্বে ফারহানের জীর্ণশীর্ণ ছোটকুটির। সালমান ফারহানকে ডেকে বলল, তোমার বাস্তুভিটা আমাকে দিয়ে দাও। তাতে ফারহান অস্বীকার করে। সালমান রাগান্বিত হয়ে বলে, জীর্ণশীর্ণ এ বাড়ি আমার প্রতিবেশি হিসেবে থাকলে আমার মান-সম্মান থাকে না।

ক. الحسد অর্থ কী?

খ. লোভ মানুষকে ধ্বংস করে কথাটি বুঝিয়ে লেখ?

গ. ফারহানের প্রতি সালমানের কেমন আচরণ হওয়া উচিত ছিল, ইসলামি শরিয়তের আলোকে উল্লেখ কর।

ঘ.সালমানের আচরণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

দোআ ও মুনাজাত

اَلدُّعَاءُ وَالْمُنَاجَاتُ

প্রথম পাঠ

কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে দোআ

দোআ (اَلدُّعَاءُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ ডাকা বা চাওয়া ,প্রার্থনা করা। দোআ হলো আদবের সাথে কাকুতি মিনতিসহ আল্লাহর কাছে চাওয়া। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল (ﷺ)-এর ভাষায় যে সব দোআ বর্ণিত হয়েছে, এগুলোকে মাসনূন দোআ বলা হয়।

কুরআনের আলোকে দোআ

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থ : তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। (সুরা মুমিন, ৬০)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

وَ اِذَا سَئَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ.

অর্থ : আমার বান্দা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, (আপনি বলে দিন) আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই- যখন সে আমাকে আহ্বান করে।

(সুরা বাকারা, ১৮৬)

হাদিসের আলোকে দোআ

রসুলে করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন—

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

অর্থ : দোআ ইবাদতের মগজ স্বরূপ। (মিশকাত, ১৯৫)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন—

مَنْ فُتِحَ لَه بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَه اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ.

অর্থ : যার জন্য দোআর দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

(মিশকাত, ১৯৫)

আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বহু দোআ শিখিয়েছেন। তার মধ্যে একটি এরূপ–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের এই আমল কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।
(সুরা বাকারা, ১২৭)

দ্বিতীয় পাঠ
কতিপয় প্রয়োজনীয় দোআ

ঘরে প্রবেশ করার দোআ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِاسْمِ اللهِ وَلَـجْنَا وَ بِاسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى اللهِ ربنا تَوَكَّلْنَا .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সর্বোত্তম প্রবেশকারী ও সর্বোত্তম প্রস্থানকারী হতে চাই, আল্লাহর নামে আমি প্রবেশ করি ও আল্লাহর নামে আমি বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর উপরই তাওয়াককুল করি।

ঘর থেকে বের হবার দোআ :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ.

অর্থ : আল্লাহর নামে (রওয়ানা করছি), আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আল্লাহ ছাড়া (আমাদের) কোনো উপায় ও শক্তি নেই।

স্থল পথে যানবাহনে আরোহণের দোআ :

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থ : পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এসব কিছুকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন। যদিও আমার এতে সামর্থবান ছিলাম না। এভাবেই আমরা সবাই আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য।

নৌপথে আরোহণের দোআ :

নদী পথের যানবাহনে (লঞ্চ/স্টিমার ইত্যাদি) আরোহণের সময় পড়তে হয়–

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّـي لَـغَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থ : আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।

মেধাশক্তি বৃদ্ধির দোআ :

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

অর্থ : হে আমার রব! আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন। (সুরা ত্বাহা, ১১৪)

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِى وَيَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ

২০২৩

অর্থ : হে রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার কাজ সহজ করে দাও। আমার জবানের বদ্ধতা খুলে দাও। আমার কথা বোঝার মতো করে দাও।

বদ নযর থেকে সুরক্ষার দোআ :

বদ নযর সত্য। সাপের বিষ থেকে বদ নযর মারাত্মক। তাই বদ নযর দেখা দিলে নিম্নের আয়াতদ্বয় পড়ে ফুঁ দিতে হয়–

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থ : এবং তোমরা যা দান কর অথবা মানত কর সে সব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন। আর অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعلَمِيْنَ

এ আয়াত পড়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দম দিলে সে আরোগ্য লাভ করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. الدعاء শব্দের অর্থ কী?

ক. আরাধনা করা খ. ডাকা বা চাওয়া
গ. প্রার্থনা করা ঘ. আলোচনা করা

২. الدُعَاء المَسنُون কী?

ক. সুন্নত সমর্থিত দোআ
খ. হাদিসের ভাষ্যে প্রাপ্ত দোআ
গ. কুরআন বর্ণিত দোআ
ঘ. রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষায় যে সব দোআ বর্ণিত হয়েছে

৩. দোআ হল-

i. কারও কাছে কোনো কিছু চাওয়া

ii. বুযুর্গানে দীনের নিকট চাওয়া

iii. আল্লাহর কাছে চাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

ফররুখ সালাত পড়ে তাড়াহুড়া করে উঠে চলে গেল। তার বন্ধু ফাহিম বলল, তুমি দোআ করো না কেন? ফররুখ বলল, সালাত পড়েছি, আর দোআর দরকার কী?

১. ফররুখ এর কাজটি শরিয়তের কোন বিধান লঙ্ঘন করেছে?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

২. ফররুখের উচিত ছিল-

i. দোআ করা

ii. তওবা ও ইস্তেগফার করা

iii. যিকির করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সাহান ও শরিফ একত্রে জামাতে সালাত আদায় করছে। সালাম ফিরানোর পর সাহান মাসনুন দোআ পাঠ করে ইমামের সাথে হাত উঠিয়ে দোআ করে। কিন্তু শরিফ চুপ করে বসে থাকে। তাকে দোআ পাঠ করতে বললে সে অস্বীকার করে এবং বলে, সালাতই দোআ।

ক. সালাতের পর দোআর হুকুম কী?

খ. সালাতের পর দোআর নিয়ম লেখ।

গ. শরিফের মনোভাব শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাহানের মনোভাব কুরআন সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০২৩
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৭ম-আকাইদ

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ইল্‌ম অর্জন ফরজ
– আল হাদিস

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত